

المؤمنون ৩৩

২২২

قَدْ أَفْلَحَ ۝



সূরা আল মুমিনুন

মক্কায় অবতীর্ণ : আয়াত ১১৮

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

- (১) মুমিনগণ সফলকাম হয়ে গেছে, (২) যারা নিজেদের নামাযে বিনয়-নয়; (৩) যারা অনর্থক কথা-বার্তায় নিলিপ্ত, (৪) যারা যাকাত দান করে থাকে (৫) এক যারা নিজেদের যৌনস্বকে সংযত রাখে। (৬) তবে তাদের স্ত্রী ও মালিকানাভুক্ত দাসীদের ক্ষেত্রে সংযত না রাখলে তারা তিরস্কৃত হবে না। (৭) অতঃপর কেউ এদেরকে ছাড়া অন্যকে কামনা করলে তারা সীমান্বনকারী হবে। (৮) এক যারা আমানত ও অঙ্গীকার সম্পর্কে হুশিয়ার থাকে (৯) এক যারা তাদের নামাযসমূহের খবর রাখে, (১০) তারাই উত্তরাধিকার লাভ করবে, (১১) তারা নীতল ছায়াময় উদ্যানের উত্তরাধিকার লাভ করবে। তারা তাতে চিরকাল থাকবে। (১২) আমি মানুষকে মাটির সারস্ব থেকে সৃষ্টি করেছি। (১৩) অতঃপর আমি তাকে শুক্রেবিন্দু রূপে এক সরস্কিত আঘারে স্থাপন করেছি। (১৪) এরপর আমি শুক্রেবিন্দুকে জমাট রক্তরূপে সৃষ্টি করেছি, অতঃপর জমাট রক্তকে মাংসপিণ্ডে পরিণত করেছি, এরপর সেই মাংসপিণ্ড থেকে অস্থি সৃষ্টি করেছি, অতঃপর অস্থিকে মাংস দ্বারা আবৃত করেছি, অবশেষে তাকে এক নতুন রূপে দাঁড় করিয়েছি। নিশ্চয়তম সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ কত কল্যাণময়! (১৫) এরপর তোমরা মৃত্যুবরণ করবে। (১৬) অতঃপর কেয়ামতের দিন তোমরা পুনরুত্থিত হবে। (১৭) আমি তোমাদের উপর সপ্তপঞ্চ সৃষ্টি করেছি এবং আমি সৃষ্টি সমুদ্রে অনবধান নই।

সূরা আল মুমিনুন

সূরা মুমিনুনের বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব : মুসনাদে-আহমদের এক রেওয়াজেতে হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) বলেন : রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি যখন ওহী নাযিল হত, তখন নিকটবর্তী লোকদের কানে মৌমাছির গুঞ্জনের ন্যায় আওয়াজ ধ্বনিত হত। একদিন তাঁর কাছে এমনি আওয়াজ শুনে আমরা সদ্যপ্রাপ্ত ওহী শোনার জন্যে ঝেমে গেলাম। ওহীর বিশেষ অবস্থা সমাপ্ত হলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) কেবলামুখী হয়ে বসে গেলেন এবং নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করতে লাগলেন :

اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا وارضا .

অর্থাৎ, “হে আল্লাহ আমাদেরকে বেশী দাও—কম দিও না। আমাদের সম্মান বৃদ্ধি কর—লাঞ্ছিত করো না। আমাদেরকে দান কর—বঞ্চিত করো না। আমাদেরকে অন্যের উপর অধিকার দাও—অন্যদেরকে অগ্রাধিকার দিয়ো না এবং আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাক এবং আমাদেরকে তোমার সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট কর।” এরপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন : এক্ষণে দশটি আয়াত নাযিল হয়েছে। কেউ যদি এ আয়াতগুলো পুরোপুরি পালন করে, তবে সে সোজা জান্নাতে যাবে। এরপর তিনি উপরোল্লিখিত দশটি আয়াত পাঠ করে শোনালেন।

ইমাম নাসায়ী তফসীর অধ্যায় ইয়াযীদ ইবনে বাবনুস থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে প্রশ্ন করেছিলেন : রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর চরিত্র কিরূপ ছিল? তিনি বললেন : তাঁর চরিত্র অর্থাৎ, স্বভাবগত অভ্যাস কোরআনে বর্ণিত আছে। অতঃপর তিনি এই দশটি আয়াত তেলাওয়াত করে বললেন : এগুলোই ছিল রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর চরিত্র ও অভ্যাস।—(ইবনে-কাসীর)

قَدْ أَفْلَحَ ۝ (সাফল্য) শব্দটি কোরআন ও হাদীসে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত

হয়েছে। আযান ও একামতে দৈনিক পাঁচবার প্রত্যেক মুসলমানকে সাফল্যের দিকে আহ্বান করা হয়। এর অর্থ প্রত্যেক মনোবাহু পূর্ণ হওয়া ও প্রত্যেক কষ্ট দূর হওয়া।—(কামুস) এই শব্দটি যেমনি সংক্ষিপ্ত, তেমনি সুদূরপ্রসারী অর্থবহ। কোন মানুষ এর চাইতে বেশী কোনকিছু কামনাই করতে পারে না। বলাবাহুল্য, একটি মনোবাহুও অপূর্ণ না থাকা এবং একটি কষ্টও অবশিষ্ট না থাকা—এরূপ পূর্ণাঙ্গ সাফল্য লাভ করা জগতে কোন মহত্তম ব্যক্তিরও আয়ত্তাধীন নয়। সপ্তরাজ্যের অধিকারী বাদশাহ হোক কিংবা সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল ও পয়গম্বর হোক, জগতে অব্যাহিত কোন কিছুর সম্মুখীন না হওয়া এবং অন্তরে বাসনা জাগ্রত হওয়া মাত্রই অবিলম্বে তা পূর্ণ হওয়া কারণে জন্মে সন্তবপর নয়। অন্য কিছু না হলেও প্রত্যেক নেয়ামতের অবসান ও ধ্বংসের ঝটকা এবং যে কোন বিপদের সম্মুখীন হওয়ার আশঙ্কা থেকে তো কেউ মুক্ত নয়।

এ থেকে জানা গেল যে, পূর্ণাঙ্গ সাফল্য দুনিয়াতে অর্জিতই হতে পারে না। কেননা, দুনিয়া কষ্ট ও শ্রমের আবাসস্থল এবং এর কোন বস্তুর স্থায়িত্ব ও স্থিরতা নেই। এই অমূল্য সম্পদ অন্য এক জগতে পাওয়া যায়, যার নাম জান্নাত। সে দেশেই মানুষের প্রত্যেক মনোবাহু সর্বক্ষণ ও বিনা

প্রতীক্ষায় অর্জিত হবে।— **وَأَهْمُوا لِلدِّينِ** অর্থাৎ, তারা যা চাইবে, তাই পাবে। সেখানে কোন সামান্যতম ব্যথা ও কষ্ট থাকবে না এবং প্রত্যেকেই একথা বলতে বলতে সেখানে প্রবেশ করবে :

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ۝ إِنَّا
أَحْكَمُ أَدَارُ الْعَامَةِ مِن فَضْلِهِ

অর্থাৎ, “সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাদের থেকে কষ্ট দূর করেছেন এবং স্বীয় কৃপায় আমাদেরকে এমন এক স্থানে দাখিল করেছেন, যার প্রত্যেক বস্তু সুপ্রতিষ্ঠিত ও চিরস্থান।” এই আয়াতে আরও ইঙ্গিত আছে যে, বিশুদ্ধগতে প্রত্যেকেই কিছু না কিছু কষ্ট ও দুঃখের সম্মুখীন হবে। তাই জান্নাতে পা রাখার সময় প্রত্যেকেই বলবে যে, এখন আমাদের দুঃখ দূর হল। কোরআন পাক সূরা আ’লায় সাফল্য লাভ করার ব্যবস্থাপত্র দিতে গিয়ে বলেছে : **قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ** অর্থাৎ, যে নিজেকে পাপকর্ম থেকে পবিত্র রেখেছে সে সাফল্যলাভ করেছে। এর সাথে সাথে আরও ইঙ্গিত করেছে যে, পূর্ণাঙ্গ সাফল্য লাভের জায়গা আসলে পরকাল। যে সাফল্য কামনা করে, তার কাজ শুধু দুনিয়া নিয়ে ব্যতিব্যস্ত থাকা নয়। বলা হয়েছে : **بَيْنَ تُوْتُونَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ خَيْرٌ وَابْقَىٰ** অর্থাৎ, তোমরা দুনিয়াকেই পরকালের উপর অগ্রাধিকার দিয়ে থাক; অথচ পরকাল উত্তমও; কারণ তাতেই প্রত্যেক মনোবাহী অর্জিত ও প্রত্যেক কষ্ট দূর হতে পারে এবং পরকাল চিরস্থায়ী ও।

মোটকথা এই যে, পূর্ণাঙ্গ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ সাফল্য তো একমাত্র জান্নাতেই পাওয়া যেতে পারে—দুনিয়া এর স্থানই নয়। তবে অধিকাংশ অবস্থার দিক দিয়ে সাফল্য অর্থাৎ, সফলকাম হওয়া ও কষ্ট থেকে মুক্তি লাভ করা—এটা দুনিয়াতেও আল্লাহ তাআলা তাঁর বন্দাদেরকে দান করে থাকেন। আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ তাআলা সেসব মুমিনকে সাফল্যদান করার ওয়াদা দিয়েছেন, যারা আয়াতে উল্লেখিত সাতটি গুণে গুণান্বিত। পরকালের পূর্ণাঙ্গ সাফল্য এবং দুনিয়ার সম্ভাব্য সাফল্য সবই এই ওয়াদার অন্তর্ভুক্ত।

আয়াতে উল্লেখিত সাতটি গুণ : সর্বপ্রথম গুণ হচ্ছে ঈমানদার হওয়া। কিন্তু এটা একটা বুনীয়াদী ও মৌলিক বিষয় বিধায় একে আলাদা করে এখানে সে সাতটি গুণ বর্ণনা করা হয়েছে, তা এই :

প্রথম, নামাযে ‘খুশু’ তথা বিনয়-নম্র হওয়া—‘খুশু’র আভিধানিক অর্থ স্থিরতা। শরীয়তের পরিভাষায় এর অর্থ অন্তরে স্থিরতা থাক; অর্থাৎ, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন কিছুর সম্পর্কে অন্তরে ইচ্ছাকৃতভাবে উপস্থিত না করা এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেও স্থিরতা থাক; অর্থাৎ, অনর্থক নড়াচড়া না করা।—(বয়ানুল-কোরআন) বিশেষতঃ এমন নড়াচড়া, যা রসূলুল্লাহ (সাঃ) নামাযে নিষিদ্ধ করেছেন। ফেকাহবিদগণ এ ধরনের নড়াচড়া ‘নামাযের মাকরুহসমূহ’ শিরোনামে সন্নিবেশিত করেছেন। তফসীরে মাযহারীতে খুশুর এই সংজ্ঞা হযরত আমর ইবনে দীনার থেকে বর্ণনা করা হয়েছে। অন্যান্য মনীষী থেকে খুশুর সংজ্ঞা সম্পর্কে যেসব উক্তি বর্ণিত আছে, সেগুলো মূলতঃ অন্তর ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্থিরতার বিশদ বিবরণ। উদাহরণতঃ হযরত মুজাহিদ বলেন : দৃষ্টি অবনত ও আওয়াজ ক্লেপ রাখার নাম খুশু। হযরত আতা বলেন : দেহের কোন অংশ নিয়ে খেলা না করা ‘খুশু’। হাদীসে হযরত আবু যর থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : নামাযের সময় আল্লাহ তাআলা বন্দার প্রতি সর্বক্ষণ দৃষ্টি নিবদ্ধ

রাখেন যতক্ষণ না নামাযী অন্য কোনদিকে জ্ঞেপ করে। যখন সে অন্য কোন দিকে জ্ঞেপ করে, তখন আল্লাহ তাআলা তার দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেন।—(আহমদ, নাসায়ী আবু দাউদ—মাযহারী) নবী করীম (সাঃ) হযরত আনাসকে নির্দেশ দেন : সেজদার জায়গার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখ এবং ডানে-বামে জ্ঞেপ করো না।—(বায়হাকী—মাযহারী)

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন : রসূলুল্লাহ (সাঃ) এক ব্যক্তিকে নামাযে দাড়ি নিয়ে খেলা করতে দেখে বললেন : **لَوْ شِئْتَ لَوَضَعْتُ لِقَابَ هَذَا** - অর্থাৎ, এই ব্যক্তির অন্তরে খুশু থাকলে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্থিরতা থাকত।—(মাযহারী)

পূর্ণ মুমিনের দ্বিতীয় গুণ : অনর্থক বিষয়াদি থেকে বিরত থাকা। **لَعَنُوا** - এর অর্থ অনর্থক কথা অথবা কাজ, যাতে কোন ধর্মীয় উপকার নেই। এর অর্থ উচ্চস্তরের গোনাহ, যাতে ধর্মীয় উপকার তো নেই-ই; বরং ক্ষতি বিদ্যমান। এ থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব। উপকার ও ক্ষতি উভয়টি না থাকা এর নিয়ন্ত্রণ। একে বর্জন করা ন্যূনপক্ষে উত্তম ও প্রশংসনীয়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : **مَنْ حَسَنَ مِنْ حَسَنِ اسْلَامِ الْمَرْءِ تَرَكَ مَا لَا يَنْفَعُهُ** অর্থাৎ, ‘মানুষ যখন অনর্থক বিষয়াদি ত্যাগ করে, তখন তার ইসলাম সৌন্দর্য মণ্ডিত হতে পারে।’ এ কারণেই আয়াতে একে কামেল মুমিনদের বিশেষ গুণ সাব্যস্ত করা হয়েছে।

তৃতীয় গুণ যাকাত : এর আভিধানিক অর্থ পবিত্র করা। পরিভাষায় মোট অর্থ-সম্পদের একটা বিশেষ অংশ কিছু শর্তসহ দান করাকে যাকাত বলা হয়। কোরআন পাকে এই শব্দটি সাধারণতঃ এই পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে এই অর্থও উদ্দেশ্য হতে পারে। এতে সন্দেহ করা হয় যে, আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ। মক্কায় যাকাত ফরয হয়নি—মদীনায় হিজরতের পর ফরয হয়েছে। ইবনে-কাসীর প্রমুখ তফসীরবিদের পক্ষ থেকে এর জওয়াব এই যে, যাকাত মক্কাতেই ফরয হয়ে গিয়েছিল। সূরা মুযাশ্শমল মক্কায় অবতীর্ণ, এ বিষয়ে সবাই একমত। এই সূরায়ও **فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا** এর সাথে **وَأَتُوا زَكَاةَ** উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু সরকারী পর্যায়ে যাকাত আদায় করার ব্যবস্থাপনা এবং ‘নিসাব’ ইত্যাদির বিস্তারিত বিবরণ মদীনায় হিজরতের পর স্থিরীকৃত হয়। যারা যাকাতকে মদীনায় অবতীর্ণ বিধানাবলীর মধ্যে গণ্য করেছেন, তাঁদের উদ্দেশ্য তাই। যারা বলেন যে, মদীনায় পৌঁছার পরই যাকাতের আদেশ অবতীর্ণ হয়েছে, তারা এস্থলে যাকাত শব্দের সাধারণ আভিধানিক অর্থ পবিত্র করা নিয়েছেন। আয়াতে এই অর্থের প্রতি আরও ইঙ্গিত রয়েছে যে, সাধারণতঃ কোরআন পাকে যেখানে ফরয যাকাতের উল্লেখ করা হয়, সেখানে **وَأَتُوا زَكَاةَ** ও **وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا** ইত্যাদি শিরোনামে বর্ণনা করা হয়। এখানে শিরোনাম পরিবর্তন করে **وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا** বলাই ইঙ্গিত করে যে, এখানে পারিভাষিক অর্থ বোঝানো হয়নি। এ ছাড়া **فَوُتُونَ** শব্দটি স্বতস্ফূর্তভাবে **فَعَلَ** (কাজ)—এর সাথে সম্পর্ক রাখে। পারিভাষিক যাকাত **فَعَلَ** নয়; বরং অর্থ-কড়ির একটা অংশ। **فَوُتُونَ** শব্দ দ্বারা এই অংশ বোঝাতে গেলে ব্যাখ্যা ও বর্ণনার আশ্রয় না নিয়ে উপায় নেই। মোটকথা, আয়াতে পারিভাষিক অর্থ নেয়া হলে যাকাত যে মুমিনের জন্যে অপরিহার্য ফরয তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। পক্ষান্তরে যাকাতের অর্থ আত্মশুদ্ধি নেয়া হলে তাও ফরযই। কেননা, শেরক, রিয়া, অহঙ্কার, হিংসা, শত্রুতা, লোভ-লালসা, কার্পণ ইত্যাদি থেকে নফসকে পবিত্র রাখাকে আত্মশুদ্ধি বলা হয়। এগুলো সব হারাম ও কবীরা গোনাহ।

নফসকে এগুলো থেকে পবিত্র করা ফরয।

চতুর্থ গুণ যৌনাক্রমে হারাম থেকে সংযত রাখা : **وَالَّذِينَ هُمْ**
لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ অর্থাৎ, যারা

স্ত্রী ও শরীয়তসম্মত দাসীদের ছাড়া সব পর নারী থেকে যৌনাক্রমে সংযত রাখে এবং এই দুই শ্রেণীর সাথে শরীয়তের বিধি মোতাবেক কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করা ছাড়া অন্য কারও সাথে কোন অবৈধ পন্থায় কামবাসনা পূর্ণ করতে প্রবৃত্ত হয় না। আয়াতের শেষে বলা হয়েছে :

وَأَنَّهُمْ غَيْرَ مُنْتَهِيْنَ অর্থাৎ, যারা শরীয়তের বিধি মোতাবেক স্ত্রী অথবা

দাসীদের সাথে কামবাসনা পূর্ণ করে, তারা তিরস্কৃত হবে না। এতে ইঙ্গিত আছে যে, এই প্রয়োজনকে প্রয়োজনের সীমায় রাখতে হবে—জীবনের লক্ষ্য করা যাবে না। এটা এই পর্যায়েরই কাজ যে, কেউ এরূপ করলে সে তিরস্কারযোগ্য হবে না।

فَمِنْ أَيْمَانِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ تَتَطَهَّرُونَ অর্থাৎ, বিবাহিত স্ত্রী

অথবা শরীয়তসম্মত দাসীর সাথে শরীয়তের বিধি মোতাবেক কামবাসনা পূর্ণ করা ছাড়া কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার আর কোন পথ হালাল নয়; যেমন—যিনা তেমনি হারাম নারীকে বিবাহ করায়ও যিনার হুকুম বিদ্যমান। স্ত্রী অথবা দাসীর সাথে হায়েয-নেফাস অবস্থায় কিংবা অস্বাভাবিক পন্থায় সহবাস করা অথবা কোন পুরুষ অথবা বালক অথবা জীব-জন্তুর সাথে কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করা—এগুলো সব নিষিদ্ধ ও হারাম। অধিক সংখ্যক তফসীরবিদের মতে **بِالْيَدِ اسْتِنَاءٌ** অর্থাৎ, হস্তমৈথুনও এর অন্তর্ভুক্ত।—(বয়ানুল-কোরআন, কুরতুবী, বাহরে-মুহীত)

পঞ্চম গুণ আমানত প্রত্যর্পণ করা : **وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ**

عُقُوبٌ আমানত শব্দের আভিধানিক অর্থে এমন প্রত্যেকটি বিষয় শামিল, যার দায়িত্ব কোন ব্যক্তি বহন করে এবং সে বিষয়ে কোন ব্যক্তির উপর আস্থা স্থাপন ও ভরসা করা হয়। এর অসংখ্য প্রকার আছে বিধায় এ শব্দটি মূল ধাতু হওয়া সত্ত্বেও একে বহুবচনে ব্যবহার করা হয়েছে, যাতে যাবতীয় প্রকার এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়—হুকুকুল্লাহ্ তথা আল্লাহর হুক সম্পর্কিত আমানত হোক কিংবা হুকুকুল-এবাদ তথা বন্দার হুক সম্পর্কিত হোক। আল্লাহর হুক সম্পর্কিত আমানত হচ্ছে শরীয়ত আরোপিত সকল ফরয ও ওয়াজিব পালন করা এবং যাবতীয় হারাম ও মাকরুহ বিষয়াদি থেকে আত্মরক্ষা করা। বন্দার হুক সম্পর্কিত আমানতের মধ্যে আর্থিক আমানত যে অন্তর্ভুক্ত, তা সুবিদিত; অর্থাৎ, কেউ কারও কাছে টাকা-পয়সা গচ্ছিত রাখলে তা তার আমানত প্রত্যর্পণ করা পর্যন্ত এর হেফাযত করা তার দায়িত্ব। এছাড়া কেউ কোন গোপন কথা কারও কাছে বললে তাও তার আমানত। শরীয়তসম্মত অনুমতি ব্যতিরেকে কারও গোপন তথ্য ফাঁস করা আমানতে খেয়ানতের অন্তর্ভুক্ত। মজুর ও কর্মচারীকে অর্পিত কাজের জন্যে পারস্পরিক সমঝোতাক্রমে যে সময় নির্ধারণ করে দেয়া হয়, তাতে সেই কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন করা এবং মজুরী ও চাকুরীর জন্যে নির্ধারিত সময়ে সেই কাজই করা এবং অন্য কাজ না করাও আমানত। কামচুরি ও সময়চুরি বিশ্বাসঘাতকতা। এতে জানা গেল যে, আমানতের হেফাযত ও তার হুক আদায় করার বিষয়টি অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী অর্থবহ। উপরোক্ত বিবরণ সবই এর অন্তর্ভুক্ত।

ষষ্ঠ গুণ অঙ্গীকার পূর্ণ করা : অঙ্গীকার বলতে প্রথমতঃ দ্বিপাক্ষিক চুক্তি বোঝায়, যা কোন ব্যাপারে উভয়পক্ষ অপরিহার্য করে নেয়। এরূপ

চুক্তি পূর্ণ করা ফরয এবং এর খেলাফ করা বিশ্বাসঘাতকতা প্রতারণা তথা হারাম। দ্বিতীয় প্রকার অঙ্গীকারকে ওয়াদা বলা হয়; অর্থাৎ, একতরফাভাবে একজন অন্য জনকে কিছু দেয়ার অথবা অন্যজনের কোন কাজ করে দেয়ার ওয়াদা করা। এরূপ ওয়াদা পূর্ণ করাও শরীয়তের আইনে জরুরী ও ওয়াজিব। হাদীসে আছে **الْعِدَّةُ دِينٌ** অর্থাৎ, ওয়াদা, এক প্রকার ঋণ। ঋণ আদায় করা যেমন ওয়াজিব, ওয়াদা পূর্ণ করাও তেমনি ওয়াজিব। শরীয়তসম্মত ওয়াদা ব্যতিরেকে এর খেলাফ করা গোনাহ্। উভয় প্রকার অঙ্গীকারের মধ্যে পার্থক্য এই যে, প্রথম প্রকার অঙ্গীকার পূর্ণ করার জন্যে প্রতিপক্ষ আদালতের মাধ্যমেও বাধ্য করতে পারে, কিন্তু এক তরফা ওয়াদা পূর্ণ করার জন্যে আদালতের মাধ্যমে বাধ্য করা যায় না। ধর্মপরায়ণতার দৃষ্টিভঙ্গিতে একে পূর্ণ করা ওয়াজিব এবং শরীয়তসম্মত ওয়াদা ব্যতীত এর খেলাফ করা গোনাহ্।

সপ্তম গুণ নামাযে যত্নবান হওয়া : **وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ**

يَتَذَكَّرُونَ নামাযে যত্নবান হওয়ার অর্থ নামাযের পাবন্দী করা এবং প্রত্যেক নামায মোস্তাহাব ওয়াজে আদায় করা।—(রুহুল-মা'আনী) এখানে **صَلَاةٌ** শব্দটি বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ, এখানে পাঁচ ওয়াজের নামায বোঝানো হয়েছে, যেগুলো মোস্তাহাব ওয়াজে পাবন্দী সহকারে আদায় করা উদ্দেশ্য। শুরুতেও নামাযের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু সেখানে নামাযে বিনয়-নম্র হওয়ার কথা বলা উদ্দেশ্য ছিল। তাই সেখানে **سَلْوَةٌ** শব্দটি একবচন ব্যবহার করা হয়েছে অর্থাৎ, নামায ফরয হোক অথবা ওয়াজিব, সুনত্ন কিংবা নফল হোক—নামায মাত্রেরই প্রাণ হচ্ছে বিনয়-নম্র হওয়া। চিন্তা করলে দেখা যায়, উল্লেখিত সাতটি গুণের মধ্যে যাবতীয় প্রকার আল্লাহর হুক ও বন্দার হুক এবং এতদসংশ্লিষ্ট সব বিধি-বিধান প্রবিষ্ট হয়ে গেছে। যে ব্যক্তি এসব গুণে গুণান্বিত হয়ে যায় এবং এতে অটল থাকে, সে কামেল মুমিন এবং ইহকাল ও পরকালের সাফল্যেরহকদার।

এখানে এ বিষয় প্রনিধানযোগ্য যে, এই সাতটি গুণ শুরুও করা হয়েছে নামায দ্বারা এবং শেষও করা হয়েছে নামায দ্বারা। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, নামাযকে নামাযের মত পাবন্দী ও নিয়ম-নীতি সহকারে আদায় করলে অবশিষ্ট গুণগুলো আপনা-আপনি নামাযীর মধ্যে সৃষ্টি হতে থাকবে।

أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْوَارِثِينَ উল্লেখিত গুণে

গুণান্বিত লোকদেরকে এই আয়াতে জন্মান্তুল-ফেরদাউসের উত্তরাধিকারী বলা হয়েছে। উত্তরাধিকারী বলার মধ্যে ইঙ্গিত আছে যে, মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি যেমন উত্তরাধিকারীর মালিকানায় আসা অমোঘ ও অনিবার্য, তেমনি এসব গুণে গুণান্বিত ব্যক্তিদের জন্মাত প্রবেশও সুনিশ্চিত। **قَدْ أَفْلَحَ** বাক্যের পর সফলকাম ব্যক্তিদের গুণাবলী পুরোপুরি উল্লেখ করার পর এই বাক্যে আরও ইঙ্গিত আছে যে, পূর্ণাঙ্গ সাফল্য ও প্রকৃত সাফল্যের স্থান জন্মাতই।

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلُوكٍ مِنْ طِينٍ - **سَلَاةٌ** অর্থ সারাংশ এবং

طِينٍ অর্থ আর্দ্র মাটি। অর্থ এই যে, পৃথিবীর মাটির বিশেষ অংশ বের করে তা দ্বারা মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। মানব সৃষ্টির সূচনা হযরত আদম (আঃ) থেকে এবং তাঁর সৃষ্টি মাটির সারাংশ থেকে হয়েছে। তাই প্রথম সৃষ্টিকে মাটির সাথে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে। এরপর এক মানুষের স্ত্রী অন্য মানুষের সৃষ্টির কারণ হয়েছে। পরবর্তী আয়াতে **ثُمَّ جَعَلْنَا نُطْفَةَ**

বলে একথাই বর্ণনা করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, প্রাথমিক সৃষ্টি মাটি দ্বারা হয়েছে, এরপর সৃষ্টিধারা এই মাটির সূক্ষ্ম অংশ অর্থাৎ, শুক্র দ্বারা চালু করা হয়েছে। গরিষ্ঠসংখ্যক তফসীরবিদগণ আয়াতের এ তফসীরই লিখেছেন। একথা বলাও সম্ভবপর যে, **سُلِّمَتْ مِنْ طِينٍ** বলে মানুষের শুক্রই বোঝানো হয়েছে। কেননা, শুক্র খাদ্য থেকে উৎপন্ন এবং খাদ্য মাটি থেকে সৃষ্টি হয়।

মানব সৃষ্টির সপ্তস্তর : আলোচ্য আয়াতসমূহে মানব সৃষ্টির সাতটি স্তর উল্লেখ করা হয়েছে। সর্বপ্রথম স্তর **سُلِّمَتْ مِنْ طِينٍ** অর্থাৎ, মৃত্তিকার সারাংশ দ্বিতীয় বীর্ষ, তৃতীয় জমাট রক্ত, চতুর্থ মাংসপিণ্ড, পঞ্চম অস্থি-পিঞ্জর, ষষ্ঠ অস্থিকে মাংস দ্বারা আবৃতকরণ ও সপ্তম সৃষ্টির পূর্ণত্ব অর্থাৎ, রূহ সঞ্চার করণ।

হযরত ইবনে-আব্বাস বর্ণিত একটি অভিনব তত্ত্ব : তফসীরে-কুরতুবীতে এস্থলে হযরত ইবনে-আব্বাস থেকে এই আয়াতের ভিত্তিতেই ‘শবে-কদর’ নির্ধারণ সম্পর্কিত একটি অভিনব তত্ত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। তা এই যে, হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) একবার সমবেত সাহাবিগণকে প্রশ্ন করলেন : রমযানের কোন তারিখে শবে কদর? সবাই উত্তরে ‘আল্লাহ তাআলাই জানেন’ বলে পাশ কাটিয়ে গেলেন। হযরত ইবনে-আব্বাস তাঁদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ ছিলেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন : আমীরুল-মুমিনীন! আল্লাহ তাআলা সপ্ত আকাশ ও সপ্ত পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, মানুষের সৃষ্টিও সপ্ত স্তরে সম্পন্ন করেছেন এবং সাতটি বস্তুকে মানুষের খাদ্য করেছেন তাই আমার তো মনে হয় যে, শবে-কদরও রমযানের সাতাশতম রাত্ৰিতে হবে। খলীফা এই অভিনব প্রমাণ শুনে বিশিষ্ট সাহাবিগণকে বললেন : এই বালকের মাথার চুলও এখন পর্যন্ত পুরোপুরি গজায়নি ; অথচ সে এমন কথা বলেছে, যা আপনারা বলতে পারেননি। ইবনে আবী শায়বার মুসনাদে এই দীর্ঘ হাদীসটি বর্ণিত রয়েছে। ইবনে-আব্বাস মানব-সৃষ্টির সপ্তস্তর বলে তাই বুঝিয়েছেন, যা আলোচ্য আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। মানুষের খাদ্যের সাতটি বস্তু সূরা আবাসার আয়াতে উল্লেখিত আছে : **فَاَنْزَلْنَا مِنْهَا حَبًا وَّعَبًّا وَتَضْبًا وَّرِزْقًا وَّحَلًّا وَّحَدَائِقَ وَّعَبْقَابًا وَّآبًا** এই আয়াতে আটটি বস্তু উল্লেখ করা হয়েছে, তন্মধ্যে প্রথমোক্ত সাতটি মানুষের খাদ্য এবং সর্বশেষ آب জন্তুদের খাদ্য।

মানব সৃষ্টির শেষ স্তর অর্থাৎ, রূহ ও জীবন সৃষ্টি করা : কোরআন পাক এ বিষয়টি এক বিশেষ ও স্বতন্ত্র ভঙ্গিতে বর্ণনা করেছে। বলেছে : **فَخَلَقْنَا لَهُ خَلْقًا آخَرَ** অর্থাৎ, আমি অতঃপর তাকে এক বিশেষ ধরনের সৃষ্টি দান করেছি। এই বিশেষ বর্ণনার কারণ এই যে, প্রথমোক্ত ছয় স্তর উপাদানও বস্তুজগতের বিবর্তনের সাথে সর্বাঙ্গী ছিল এবং এই শেষ ও সপ্তম স্তর অন্য জগত, রূহ জগত তথা রূহ দেহে স্থানান্তরিত হওয়ার স্তর ছিল। তাই একে অন্য ধরনের সৃষ্টি বলে ব্যক্ত করা হয়েছে।

প্রকৃত রূহ ও জৈব রূহ : এখানে **خَلَقْنَا لَهُ** এর তফসীর হযরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, শা’বী, ইকরামা, যাহহাক, আবুল আলিয়া প্রমুখ তফসীরবিদ ‘রূহ সঞ্চার’ দ্বারা করেছেন। তফসীরে-মাহহারীতে আছে, সম্ভবতঃ এই রূহ বলে জৈব রূহ বোঝানো হয়েছে, কারণ, এটাও বস্তুবাচক ও সূক্ষ্ম দেহবিশেষ, যা জৈব দেহের প্রতি রম্ভে রম্ভে অনুপ্রবিষ্ট থাকে। চিকিৎসাবিদ ও দার্শনিকরা একে রূহ বলেন। মানুষের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সৃষ্টি করার পর একে সৃষ্টি করা হয়। তাই একে **نفس** শব্দ দ্বারা

ব্যক্ত করা হয়েছে। ‘আলমে-আরওয়াহ’ তথা রূহ জগত থেকে প্রকৃত রূহকে এনে আল্লাহ তাআলা স্বীয় কুদরত দ্বারা এই জৈব রূহের সাথে তার সম্পর্ক সৃষ্টি করে দেন। এর স্বরূপ জানা মানুষের সাধ্যাতীত। এই প্রকৃত রূহকে মানব সৃষ্টির বহু পূর্বে সৃষ্টি করা হয়েছে। অনাদিকালে আল্লাহ তাআলা এসব রূহকে সমবেত করে **اَسْتَوَيْنَا** বলেছিলেন। উত্তরে সবাই সম্মত হয়ে **بلى** বলে আল্লাহর পালকত্ব স্বীকার করে নিয়েছিল। হা, মানবদেহের সাথে এর সম্পর্ক মানবের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সৃষ্টির পরে স্থাপিত হয়। এখানে ‘রূহ সঞ্চার’ দ্বারা যদি জৈব রূহের সাথে প্রকৃত রূহের সম্পর্ক স্থাপন বোঝানো হয়, তবে এটাও সম্ভবপর। মানবজীবন প্রকৃতপক্ষে এই প্রকৃত রূহের সাথে সম্পর্ক রাখে। জৈব রূহের সাথে এর সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে গেলেই মানুষ জীবন্ত হয়ে উঠে এবং সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেলে মানুষকে মৃত বলা হয়। জৈব রূহও তখন তার কাজ ত্যাগ করে।

فَتَرَكْنَا اللَّهُ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ এর আসল অর্থ

নতুনভাবে কোন সাবেক নমুনা ছাড়া কোন কিছু সৃষ্টি করা, যা আল্লাহ তাআলারই বিশেষ গুণ। এই অর্থের দিক দিয়ে **خالق** (সৃষ্টা) একমাত্র আল্লাহ তাআলাই। অন্য কোন ফেরেশতা অথবা মানব কোন সামান্যতম বস্তুও সৃষ্টিকর্তা হতে পারে না। কিন্তু মাঝে মাঝে **خالق و خالق** শব্দ কারিগরীর অর্থেও ব্যবহার করা হয়। কারিগরীর স্বরূপ এর বেশী কিছু নয় যে, আল্লাহ তাআলা স্বীয় কুদরত দ্বারা এই বিশু ভূমণ্ডলে যেসব উপকরণ ও উপাদান সৃষ্টি করে রেখেছেন, সেগুলোকে জোড়াতালি দিয়ে পরস্পরে মিশ্রণ করে এক নতুন জিনিস তৈরী করা। একাজ প্রত্যেক মানুষই করতে পারে এবং এই অর্থের দিক দিয়ে কোন মানুষকেও কোন বিশেষ বস্তু সৃষ্টিকর্তা বলে দেয়া হয়। স্বয়ং কোরআন বলেছে : **وَتَخْلُقُونَ أَفْكَا** হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে বলেছে : **إِنِّي آخِئْتُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ** এসব ক্ষেত্রে **خالق** শব্দ রূপকভঙ্গিতে কারিগরীর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

এমনিভাবে এখানে **خالقين** শব্দটি বহুবচনে ব্যবহৃত হয়েছে। কারণ, সাধারণ মানুষ কারিগরীর দিক দিয়ে নিজেদেরকে কোন বস্তু সৃষ্টিকর্তা মনে করে থাকে। যদি তাদেরকে রূপকভাবে সৃষ্টিকর্তা বলাও হয়, তবে আল্লাহ তাআলা সব সৃষ্টিকর্তা অর্থাৎ, কারিগরের মধ্যে সর্বোত্তম কারিগর।

ثُمَّ اَرْسَلْنَاكَ ذَاكَ لِمَنْ يَتُوبُونَ পূর্ববর্তী ১২-১৪ তিন আয়াতে মানব

সৃষ্টির প্রাথমিক স্তর উল্লেখ করা হয়েছিল, এখন ১৫ ও ১৬ আয়াতে তার শেষ পরিণতির কথা আলোচনা করা হচ্ছে। আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে : তোমরা সবাই এ জগতের আসা ও বসবাস করার পর মৃত্যুর সম্মুখীন হবে। কেউ এর কবল থেকে রক্ষা পাবে না। অতঃপর বলা হয়েছে :

ثُمَّ اَرْسَلْنَاكُمْ اُمَّمًا تُجْعَلُونَ - অর্থাৎ, মৃত্যুর পর আবার কেয়ামতের

দিন তোমাদেরকে জীবিত করে পুনরুত্থিত করা হবে, যাতে তোমাদের ক্রিয়াকর্মের হিসাবান্তে তোমাদেরকে আসল ঠিকানা জান্নাত অথবা জাহান্নামে পৌছে দেয়া হয়। এ হচ্ছে মানুষের শেষ পরিণতি। অতঃপর সূচনা ও পরিণতি অন্তর্বর্তীকালীন অবস্থা এবং তাতে মানুষের প্রতি আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ ও নেয়ামতরাজির অস্প-বিস্তার বর্ণনা আছে, যা পরবর্তী আকাশ সৃষ্টির আলোচনা দ্বারা শুরু করা হয়েছে।

وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ - **طَرِيقٌ** শব্দটি এর

বহুবচন। একে স্তরের অর্থেও নেয়া যায়। অর্থ এই যে, স্তরে স্তরে সপ্ত

المؤمنون

৩৩

قَدَافِلُهُ

وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَتْهُ فِي الْأَرْضِ نَ وَالْأَعْلَى
 ذَهَابٍ بِهِ لَقَدْ رُؤِنَ وَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَدِيدًا مِنَ خَشْيَتِكُمْ وَ
 أَعْيَابِكُمْ فِيهَا قَوَائِدُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۝ وَشَجَرَةً
 تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالذِّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْأَعْيُنِ ۝ وَ
 إِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً لِمِمَّا كُنْتُمْ تُخَفُونَ ۝ وَمِنْهَا
 مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۝ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُخْرَجُونَ ۝
 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ
 مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۝ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ
 قَوْمِهِ لَمَهْدِي الْأَشْرَارِ وَمَثَلُوا بَرِيدًا أَنْ يَنْفَضَلَ عَلَيْهِمْ كُرْسِيُّ
 اللَّهِ أَذْكُرُونَ ۝ فَسَخَّرْنَا هَٰؤُلَاءِ لِقَوْمِهِ الْأَوَّلِينَ إِنَّ هُوَ
 الْأَرْجُلُ بِهِ جَنَّةٌ مَثَلُوا بِرُؤْيَا هَٰؤُلَاءِ حَتَّىٰ حِينٍ ۝ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي
 بِمَا كَذَّبُونِ ۝ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا
 وَوَحَيْنَا إِذْ جَاءَ أَمْرُنَا وَقَارَ اللَّتُونُ فَاصْنَعِ الْفُلْكَ فِيهَا مِنْ كُلِّ
 زَوْجٍ مِثْقَلِ ذَرَّةٍ مِنْهَا شَاءَ اللَّهُ وَاجْعَلِ فِيهَا مَنَافِعَ لِلنَّاسِ لِقَوْمٍ
 لَّا يَشْكُرُونَ ۝

(১৮) আমি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে থাকি পরিমাণ মত অতঃপর আমি জমিনে সংরক্ষণ করি এবং আমি তা অপসারণও করতে সক্ষম। (১৯) অতঃপর আমি তা দূরা তোমাদের জন্যে খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান সৃষ্টি করেছি। তোমাদের জন্যে এতে প্রচুর ফল আছে এবং তোমরা তা থেকে আহাশ করবে থাক। (২০) এবং ঐ বৃক্ষ সৃষ্টি করেছি, যা সিনাই পর্বতে জন্মায় এবং আহাশকারীদের জন্যে তৈল ও ব্যঞ্জন উৎপন্ন করে। (২১) এবং তোমাদের জন্যে চতুশদ জন্তুসমূহের মধ্যে চিন্তা করার বিষয় রয়েছে। আমি তোমাদেরকে তাদের উদরস্থিত বস্তু থেকে পান করাই এবং তোমাদের জন্যে তাদের মধ্যে প্রচুর উপকারিতা আছে। তোমরা তাদের কতককে ভক্ষণ কর। (২২) তাদের পিঠে ও জলযানে তোমরা আরোহণ করে চলাফেরা করে থাক। (২৩) আমি নূহকে তার সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করেছিলাম। সে বলেছিল : হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহর বন্দেগী কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন মাবুদ নেই। তোমরা কি ভয় কর না! (২৪) তখন তার সম্প্রদায়ের কাফের-প্রধানরা বলেছিল : এ তো তোমাদের মতই একজন মানুষ বৈ নয়। সে তোমাদের উপর নেতৃত্ব করতে চায়। আল্লাহ ইচ্ছা করলে ফেরেশতাই নাফিল করতেন। আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে এরূপ কথা শুনিনি। (২৫) সে তো এক উম্মাদ ব্যক্তি বৈ নয়। সুতরাং কিছুকাল তার ব্যাপারে অপেক্ষা কর। (২৬) নূহ বলেছিল : হে আমার পালনকর্তা, আমাকে সাহায্য কর; কেননা, তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বন্দেছে। (২৭) অতঃপর আমি তার কাছে আদেশ প্রেরণ করলাম যে, তুমি আমার দৃষ্টির সামনে এবং আমার নির্দেশে নৌকা তৈরী কর। এরপর যখন আমার আদেশ আসে এবং চুল্লী প্লাবিত হয়, তখন নৌকায় তুলে নাও, প্রত্যেক জীবের এক এক জোড়া এবং তোমার পরিবারবর্গকে, তাদের মধ্যে যাদের বিপক্ষে পূর্বে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে তাদের ছাড়া। এবং তুমি জালেমদের সম্পর্কে আমাকে কিছু বলো না। নিশ্চয় তারা নিমজ্জিত হবে।

আকাশ তোমাদের উর্ধ্ব সৃষ্টি করা হয়েছে। এর প্রসিদ্ধ অর্থ রাস্তা। এ অর্থও হতে পারে। কারণ, সবগুলো আকাশ বিধানাবলী নিয়ে পৃথিবীতে যাতায়াতকারী ফেরেশতাদের পথ।

وَالْمُتَعَلِّقِينَ ۝ এতে বলা হয়েছে যে, আমি মানুষকে

শুধু সৃষ্টি করেই ছেড়ে দেইনি। এবং আমি তাদের ব্যাপারে বেখবরও হতে পারি না; বরং তাদের পালন, বসবাস ও সুখের সরঞ্জামও সরবরাহ করেছি। আকাশ সৃষ্টি দূরা এ কাজের সূচনা হয়েছে। এরপর আকাশ থেকে বারিবর্ষণ করে মানুষের জন্যে খাদ্য ও ফল-ফুল দূরা সুখের সরঞ্জাম সৃষ্টি করেছি। পরবর্তী আয়াতে তা এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَتْهُ فِي الْأَرْضِ نَ وَالْأَعْلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَدْ رُؤِنَ

মানুষকে পানি সরবরাহের অতুলনীয় প্রাকৃতিক ব্যবস্থা : এই আয়াতে আকাশ থেকে বারিবর্ষণের আলোচনার সাথে بِقَدَرٍ কথাটি যুক্ত করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মানুষ সৃষ্টিগতভাবে খুবই দুর্বল। ফলে যেসব জিনিস তার জীবনের জন্যে অপরিহার্য, সেগুলো নির্ধারিত পরিমাণের বেশী হয়ে গেলে তার জন্যে বিশেষ ক্ষতিকর এমনকি আঘাত হয়ে যায়। যে পানির অপর নাম জীবন, সেই পানি প্রয়োজনের চাইতে বেশী বর্ষিত হয়ে গেলে প্লাবন এসে যায় এবং মানুষ ও তার জীবন-জীবিকার জন্যে বিপদ ও আঘাত হয়ে পড়ে। তাই আকাশ থেকে বারিবর্ষণও পরিমিতভাবে হয়, যা মানুষের অভাব দূর করে দেয় এবং সর্বনাশের কারণ হয় না। তবে যেসব ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলা কোন কারণে প্লাবন-তুফান চাপিয়ে দেয়ার ইচ্ছা করেন, সেসব ক্ষেত্রে ভিন্ন।

অতঃপর আরবের মেজায় ও রুচি অনুযায়ী এমন কিছুসংখ্যক বস্তুর কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলো পানি দূরা উৎপন্ন। বলা হয়েছে, খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান পানি সেচের দূরাই সৃষ্টি করা হয়েছে।

لَكُمْ فِيهَا قَوَائِدُ كَثِيرَةٌ ۝ বাক্যে অন্যান্য ফলের কথাও আলোচনা

করা হয়েছে, অর্থাৎ, এসব বাগানে তোমাদের জন্যে খেজুর ও আঙ্গুর ছাড়া হাজারো প্রকারের ফল সৃষ্টি করেছি। এগুলো তোমরা শুধু মুখরোচক হিসেবেও খাও এবং কোন কোন ফল গোলাজাত করে খাদ্য হিসেবে ভক্ষণ কর।

وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۝ বাক্যের মতলব তাই। এরপর বিশেষ করে যয়তুন ও তার তৈল সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। কেননা, এর উপকারিতা অপরিমিত।

যয়তুনের বৃক্ষ তুর পর্বতে উৎপন্ন হয় বিধায় এর দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে। বলা হয়েছে وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ ۝ সায়ানা ও সিনিন সেই স্থানের নাম, যেখানে তুর পর্বত অবস্থিত। যয়তুনের তৈল মালিশ ও বাতি জ্বালানোর কাজেও আসে এবং ব্যঞ্জনেরও কাজ দেয়। তাই বলা হয়েছে

تَنْبُتُ بِالذِّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْأَعْيُنِ ۝ যয়তুন বৃক্ষের জন্যে বিশেষতঃ তুর

পর্বতের উল্লেখ করার কারণ এই যে, এই বৃক্ষ সর্বপ্রথম তুর পর্বতেই উৎপন্ন হয়েছিল। কেউ কেউ বলেন : তুফানে-মূহের পর পৃথিবীতে সর্বপ্রথম যে বৃক্ষ উৎপন্ন হয়েছিল, তা ছিল যয়তুন—(মাহহারী)



(২৮) যখন তুমি ও তোমার সঙ্গীরা নৌকায় আরোহণ করবে, তখন বল : আল্লাহর শোকর, যিনি আমাদেরকে জ্বালেম সম্প্রদায়ের কবল থেকে উদ্ধার করেছেন। (২৯) আরও বল : পালনকর্তা, আমাকে কল্যাণকরভাবে নামিয়ে দাও, তুমি শ্রেষ্ঠ অবতারণকারী। (৩০) এতে নিদর্শনাবলী রয়েছে এবং আমি পরীক্ষাকারী। (৩১) অতঃপর অন্য এক সম্প্রদায় আমি তার স্থলাভিষিক্ত করেছিলাম। (৩২) এবং তাদেরই একজনকে তাদের মধ্যে রসুলরূপে প্রেরণ করেছিলাম এই বলে যে, তোমরা আল্লাহর বন্দেগী কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন মাবুদ নেই। তবুও কি তোমরা ভয় করবে না? (৩৩) তাঁর সম্প্রদায়ের প্রধানরা যারা কাফের ছিল, পরকালের সাক্ষাতকে মিথ্যা বলত এবং যাদেরকে আমি পার্শ্ববর্তী জীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দিয়েছিলাম, তারা বলল : এতো আমাদের মতই একজন মানুষ বৈ নয়। তোমরা যা খাও, সেও তাই খায় এবং তোমরা যা পান কর, সেও তাই পান করে। (৩৪) যদি তোমরা তোমাদের মতই একজন মানুষের আনুগত্য কর, তবে তোমরা নিশ্চিতরূপেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (৩৫) সে কি তোমাদেরকে এই ওয়াদা দেয় যে, তোমরা মারা গেলে এবং মৃত্তিকা ও অস্থিতে পরিণত হলে তোমাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করা হবে? (৩৬) তোমাদেরকে যে ওয়াদা দেয়া হচ্ছে, তা কোথায় হতে পারে? (৩৭) আমাদের পার্শ্ববর্তী জীবনই একমাত্র জীবন। আমরা মরি ও বাঁচি এখানেই এবং আমরা পুনরুজ্জীবিত হবো না। (৩৮) সে তো এমন ব্যক্তি বৈ নয়, যে আল্লাহ সমুদ্রে মিথ্যা উদ্ভাবন করেছে এবং আমরা তাকে বিশ্বাস করি না। (৩৯) তিনি বললেন : হে আমার পালনকর্তা, আমাকে সাহায্য কর, কারণ তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলছে। (৪০) আল্লাহ বললেন : কিছু দিনের মধ্যে তারা সকাল বেলা অনুতপ্ত হবে। (৪১) অতঃপর সত্য সত্যই এক ভয়ংকর শব্দ তাদেরকে হতচকিত করল এবং আমি তাদেরকে বাত্যা-তাড়িত আবর্জনা সদৃশ করে দিলাম। অতঃপর ধ্বংস হোক পাপী সম্প্রদায়। (৪২) এরপর তাদের পরে আমি বহু সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছি।

এরপর আল্লাহ তাআলা এমন নেয়ামতের কথা উল্লেখ করেছেন, যা জানোয়ার ও চতুষ্পদ জন্তুদের মাধ্যমে মানুষকে দান করেছে, যাতে মানুষ শিক্ষা গ্রহণ করে এবং আল্লাহ তাআলার অপার শক্তি ও অপারিসীম রহমতের কথা স্মরণ করে তওহীদ ও এবাদতে মশগুল হয়। বলা হয়েছে : **وَإِنْ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لُوبُؤٌ** অর্থাৎ, তোমাদের জন্যে চতুষ্পদ জন্তুদের মধ্যে শিক্ষা ও উপদেশ রয়েছে। অতঃপর এর কিছু বিবরণ এভাবে দেয়া হয়েছে : **نُسَيْبُكُمْ وَمِمَّا فِي بُطُونِهَا** অর্থাৎ, এসব জন্তুর পেটে আমি তোমাদের জন্যে পাক-স্বাদু দুধ তৈরী করেছি, যা মানুষের উৎকৃষ্ট খাদ্য। এরপর বলা হয়েছে : শুধু দুধই নয়, এসব জন্তুর মধ্যে তোমাদের জন্যে অনেক (অগণিত) উপকারিতা রয়েছে। **وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ** চিন্তা করলে দেখা যায়, জন্তুদের দেহের প্রতিটি অংশ, প্রতিটি লোম মানুষের কাছে আসে এবং তার দ্বারা মানুষের জীবনধারণের অসংখ্য প্রকার সরঞ্জাম তৈরী হয়। জন্তুদের পশম, অস্থি, অস্ত্র এবং সমস্ত অংশ দ্বারা মানুষ জীবিকার কত যে সাজ-সরঞ্জাম তৈরী করে, তা গণনা করাও কঠিন। এসব উপকার ছাড়া আরও একটি বড় উপকার এই যে, হালাল জন্তুদের মাংসও মানুষের সর্বোৎকৃষ্ট খাদ্য **وَمِمَّا تَكْتُمُونَ** পরিশেষে জন্তু-জানোয়ারদের আরও একটি মহা উপকারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে, তোমরা তাদের পিঠে আরোহণও কর এবং মাল পরিবহনের কাজেও নিযুক্ত কর। এই শেষ উপকারের মধ্যে জন্তুদের সাথে নদীতে চালাচলকারী নৌকাও শরীক আছে। মানুষ নৌকায় আরোহণ করে এবং মালপত্র একস্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যায়। তাই এর সাথে নৌকার কথাও আলোচনা করে বলা হয়েছে : **وَعَلَيْكُمْ وَعَلَى الْمَلِكِ الْمُحْتَمِلِ** চাকার মাধ্যমে চলে এমন সেব যানবাহনও নৌকার লুকুম রাখে।

وَكَاكَرُ التُّورِ - চুল্লীকে বলা হয়, যা রুটি পাকানোর জন্যে তৈরী

করা হয়। এই অর্থই প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত। এর অপর অর্থ ভূপৃষ্ঠ। কেউ কেউ এ দ্বারা বিশেষ চুল্লীর অর্থই নিয়েছেন, যা কুফার মসজিদের এবং কারও কারও মতে সিরিয়ার কোন এক জায়গায় ছিল। এই চুল্লী উখলিত হওয়াকেই নূহ (আঃ)-এর জন্যে মহাপ্লাবনের আলামত ঠিক করা হয়েছিল।—(মায়হারী) হযরত নূহ (আঃ), তাঁর মহাপ্লাবন ও নৌকার ঘটনা পূর্ববর্তী সূরাসমূহে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্বকার আয়াতসমূহে হেদায়েতের আলোচনা প্রসঙ্গে নূহ (আঃ)-এর কাহিনী উল্লেখ করা হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে অন্যান্য পয়গম্বর ও তাঁদের উম্মতদের অবস্থা সংক্ষেপে এবং নাম নির্দিষ্ট না করে বর্ণনা করা হয়েছে। তফসীরকারকগণ বলেন : লক্ষণাদি দৃষ্টে মনে হয়, এসব আয়াতে আ'দ অথবা সামূদ অথবা উভয় সম্প্রদায়ের কথা বলা হয়েছে। আ'দ সম্প্রদায়ের প্রতি হযরত হুদ (আঃ)-কে প্রেরণ করা হয়েছিল এবং সামূদ সম্প্রদায়ের পয়গম্বর ছিলেন হযরত সালেহ (আঃ)। এই কাহিনীতে বলা হয়েছে যে, এসব সম্প্রদায় এক **صِيْفَةٌ** অর্থাৎ, ভয়ংকর শব্দ দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। অন্যান্য আয়াতে সামূদ সম্প্রদায় সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তারা মহা চীৎকার দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। এ থেকে কোন কোন তফসীরকারক বলেন : আলোচ্য আয়াতসমূহে **قَوْمًا آخَرِينَ** বলে

المؤمنون ১৩

৩৩৭

قد افلحوا ১৪

مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ﴿١٣٧﴾ ثُمَّ أَرْسَلْنَا
رُسُلَنَا تَتْرًا كُلَّمَا جَاءَ أُمَّةٌ رَسُولًا كَذَّبُوهُ فَاتَّبَعْنَا بَعْضَهُمْ
بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثًا فَبُعَدَ الْقَوْمُ لَأَيُّ مُؤْمِنٍ ﴿١٣٨﴾ ثُمَّ
أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ ذُرِّيَّتَيْنَا وَسُلْطِينَ مُبِينِينَ ﴿١٣٩﴾
إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ ﴿١٤٠﴾ فَهَالِكًا
أُولَئِكَ لِيَسْخَرَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَتُؤْمِنُوا بِاللَّعِينِينَ ﴿١٤١﴾ فَكَلَّمْنَا
مُوسَىٰ الْكَلِيمَ ﴿١٤٢﴾ وَقَالُوا إِنَّا نَحْنُ الْمُهَلَّكُونَ ﴿١٤٣﴾ وَكَلَّمْنَا
مُوسَىٰ الْكَلِيمَ ﴿١٤٤﴾ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّةً آيَةً وَأَوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ
رَبْوَةٍ ذَاتِ أَعْرَابٍ فَوَجَدِيْنَهُمَا إِذَا الْمَأْتِنُ الرَّسُلُ كَلِمَاتٍ
وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنَّا بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿١٤٥﴾ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً
وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ﴿١٤٦﴾ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا
كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿١٤٧﴾ فَذَرْنُوهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ
حِينٍ ﴿١٤٨﴾ أَلَيْسَ لَنَا بِدِينٍ لَّا يَشْعُرُونَ ﴿١٤٩﴾ إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ
رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ﴿١٥٠﴾ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿١٥١﴾

(৪৩) কোন সম্প্রদায় তার নির্দিষ্ট কালের আগে যেতে পারে না এবং পশ্চাতেও থাকতে পারে না। (৪৪) এরপর আমি একাদিক্রমে আমার রসুল প্রেরণ করেছি। যখনই কোন উম্মতের কাছে তাঁর রসুল আগমন করেছেন, তখনই তারা তাঁকে মিথ্যাবাদী বলেছে। অতঃপর আমি তাদের একের পর এক ধ্বংস করেছি এবং তাদেরকে কাহিনীর বিষয়ে পরিণত করেছি। সুতরাং ধ্বংস হোক অবিশ্বাসীরা। (৪৫) অতঃপর আমি মুসা ও হারুনকে প্রেরণ করেছিলাম আমার নিদর্শনাবলী ও সুস্পষ্ট সনদসহ, (৪৬) ফেরআউন ও তার অমাতাদের কাছে অতঃপর তারা অহংকার করল এবং তারা উদ্ধৃত সম্প্রদায় ছিল। (৪৭) তারা বলল : আমরা কি আমাদের মতই এ দুই ব্যক্তিতে বিশ্রাস স্থাপন করব; অথচ তাদের সম্প্রদায় আমাদের দাস? (৪৮) অতঃপর তারা উভয়কে মিথ্যাবাদী বলল। ফলে তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হল। (৪৯) আমি মুসাকে কিতাব দিয়েছিলাম যাতে তারা সংপথ পায়। (৫০) এবং আমি মরিয়ম তনয় ও তাঁর মাতাকে এক নিদর্শন দান করেছিলাম এবং তাদেরকে এক অবস্থানযোগ্য স্বচ্ছ পানি বিশিষ্ট টিলায় আশ্রয় দিয়েছিলাম। (৫১) হে রসুলগণ, পবিত্র বস্ত্র আহার করুন এবং সংকাজ করুন। আপনারা যা করেন সে বিষয়ে আমি পরিজ্ঞাত। (৫২) আপনাদের এই উম্মত সব তো একই ধর্মের অনুসারী এবং আমি আপনাদের পালনকর্তা; অতএব আমাকে ভয় করুন। (৫৩) অতঃপর মানুষ তাদের বিষয়কে বহুখা বিভক্ত করে দিয়েছে। প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে আনন্দিত হচ্ছে। (৫৪) অতএব তাদের কিছুকালের জন্যে তাদের অজ্ঞানতায় নিমজ্জিত থাকতে দিন। (৫৫) তারা কি মনে করে যে, আমি তাদেরকে ধন-সম্পদ ও সম্মান-সম্পত্তি দিয়ে যাচ্ছি। (৫৬) তাতে করে তাদেরকে দ্রুত মঙ্গলের দিকে নিয়ে যাচ্ছি? বরং তারা বোঝে না। (৫৭) নিশ্চয় যারা তাদের পালনকর্তার ভয়ে সন্ত্রস্ত, (৫৮) যারা তাদের পালনকর্তার কথায় বিশ্রাস স্থাপন করে,

সামুদ সম্প্রদায়কে বোঝানো হয়েছে। কিন্তু এটাও সম্ভবপর যে, **صَلَاتٍ** শব্দের অর্থ আযাব হলে আ'দ সম্প্রদায়ও উদ্দেশ্য হতে পারে।

إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نحْنُ بِمُعْرَبِينَ

পার্থিব জীবন ছাড়া আর কোন জীবন নেই। সুতরাং জীবন-মরণ এই দুনিয়ারই এবং কোন পুনরুজ্জীবন নেই। কেয়ামতে অবিশ্বাসী সাধারণ কাফেরদের কথা তাই। যারা মুখে এই অস্বীকৃতি প্রকাশ করে, তারা তো খোলাখুলি কাফেরই, কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, আজকাল অনেক মুসলমানেরও কথা ও কাজের মধ্যে এই অস্বীকৃতি ফুটে ওঠে। তারা পরকাল ও কেয়ামতের হিসাবের প্রতি কোন সময় লক্ষ্যও করে না। আল্লাহ তাআলা ঈমানদারগণকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করুন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এর **كَلِيمَاتٍ** - **يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كَلِمَاتٍ وَاعْمَلُوا صَالِحًا**

আভিধানিক অর্থ পবিত্র ও উত্তম বস্তু। ইসলামী শরীয়তে যেসব বস্তু হারাম করা হয়েছে, সেগুলো পবিত্রও নয় এবং জ্ঞানীদের দৃষ্টিতে উত্তম বা কাম্যও নয়। তাই **كَلِيمَاتٍ** দ্বারা শুধু বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ দিক দিয়ে পবিত্র ও হালাল বস্তুসমূহই বোঝাতে হবে। আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, পয়গম্বরগণকে তাঁদের সময়ে দুই বিষয়ের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এক হালাল ও পবিত্র বস্তু আহার কর, দুই সংকর্ম কর। আল্লাহ তাআলা পয়গম্বরগণকে নিষাপ রেখেছিলেন, তাঁদেরকেই যখন একথা বলা হয়েছে, তখন উম্মতের জন্যে এই আদেশ আরও পালনীয়। বস্তুতঃ আসল উদ্দেশ্যও উম্মতকে এই আদেশের অনুগামী করা।

আলেমগণ বলেন : এই দু'টি আদেশকে একসাথে বর্ণনা করার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, সংকর্ম সম্পাদনে হালাল খাদ্যের প্রভাব অপরিসীম। খাদ্য হালাল হলে সংকর্মের তওফীক আপন-আপনি হতে থাকে। পক্ষান্তরে খাদ্য হারাম হলে সংকর্মের ইচ্ছা করা সম্ভবে তাতে নানা বিপত্তি প্রতিবন্ধক হয়ে যায়। হাদীসে আছে, কেউ কেউ সুদীর্ঘ সফর করে এবং খুলি-ধুসরিত থাকে। এরপর আল্লাহর সামনে দোয়ার জন্যে হাত প্রসারিত করে ইয়া রব, ইয়া রব-বলে ডাকে, কিন্তু তাদের খাদ্যও হারাম এবং পানীয়ও হারাম। পোশাকও হারাম দ্বারা তৈরী হয় এবং হারাম পখেই তাদের খাদ্য আসে। এরূপ লোকদের দোয়া কিরূপে কবুল হতে পারে?—(কুরতুবী)

এ থেকে বোঝা গেল যে, এবাদতে ও দোয়া কবুল হওয়ার ব্যাপারে হালাল খাদ্যের অনেক প্রভাব আছে। খাদ্য হালাল না হলে এবাদত ও দোয়া কবুল হওয়ার যোগ্য হয় না।

শব্দটি সম্প্রদায় ও কোন বিশেষ

পয়গম্বরের জাতির অর্থে প্রচলিত ও সুবিদিত। কোন সময় তরীকা ও দ্বীনের অর্থেও ব্যবহৃত হয়; যেমন **وَجَدْنَا آلَآبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ** আয়াতে দ্বীন ও তরীকা অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতেও এই অর্থ বোঝানো হয়েছে।

শব্দটি এর **زُبُرًا** - **فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا**

অর্থ কিতাব। এই অর্থের দিক দিয়ে আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তাআলা সব পয়গম্বর ও তাঁদের উম্মতকে মূলনীতি ও বিশ্রাসের ক্ষেত্রে



(৫৯) যারা তাদের পালনকর্তার সাথে কাউকে শরীক করে না (৬০) এবং যারা যা দান করবার, তা ভীত, কম্পিত হৃদয়ে এ কারণে দান করে যে, তারা তাদের পালনকর্তার কাছে প্রত্যাবর্তন করবে, (৬১) তারা ই কল্যাণ দ্রুত অর্জন করে এবং তারা তাতে অগ্রগামী। (৬২) আমি কাউকে তার সাধ্যাতীত দায়িত্ব অর্পণ করি না। আমার এক কিতাব আছে, যা সত্য ব্যক্ত করে এবং তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না। (৬৩) না, তাদের অন্তর এ বিষয়ে অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন, এ ছাড়া তাদের আরও কাজ রয়েছে, যা তারা করছে (৬৪) এমনকি, যখন আমি তাদের ঐশ্বর্যশালী লোকদেরকে শান্তি দ্বারা পাকড়াও করব, তখনই তারা চীৎকার জুড়ে দেবে। (৬৫) অদ্য চীৎকার করো না। তোমরা আমার কাছ থেকে নিষ্কৃতি পাবে না। (৬৬) তোমাদেরকে আমার আয়াতসমূহ শোনানো হত, তখন তোমরা উল্টো পথে সরে পড়ত। (৬৭) অহংকার করে এ বিষয়ে অর্থহীন গল্প-গুজব করে যেতে। (৬৮) অতএব তারা কি এই কালাম সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে না? না তাদের কাছে এমন কিছু এসেছে, যা তাদের পিতৃপুরুষদের কাছে আসেনি? (৬৯) না তারা তাদের রসূলকে চেনে না, ফলে তারা তাঁকে অস্বীকার করে? (৭০) না তারা বলে যে, তিনি পাগল? বরং তিনি তাদের কাছে সত্য নিয়ে আগমন করেছেন এবং তাদের অধিকাংশ সত্যকে অস্বীকার করে। (৭১) সত্য যদি তাদের কাছে কামনা-বাসনার অনুসারী হত, তবে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং এগুলোর মধ্যবর্তী সবকিছুই বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ত। বরং আমি তাদেরকে দান করেছি উপদেশ, কিন্তু তারা তাদের উপদেশ অনুধাবন করে না। (৭২) না আপনি তাদের কাছে কোন প্রতিদান চান? আপনার পালনকর্তার প্রতিদান উত্তম এবং তিনিই রিযিকদাতা। (৭৩) আপনি তো তাদেরকে সোজা পথ দাওয়াত দিচ্ছেন; (৭৪) আর যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, তারা সোজা পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে।

একই দীন ও তরীকা অনুযায়ী চলার নির্দেশ দিয়েছিলেন, কিন্তু উস্মতগণ তা মানেনি। তারা পরস্পর বহুধাভিত্তক হয়ে পড়েছে এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ তরীকা ও কিতাব আলাদা করে নিয়েছে। زیر শব্দটি কোন সময় زیر এরও বহুবচন হয়। এর অর্থ খণ্ড ও উপদল। এখানে এই অর্থই সুস্পষ্ট। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, তারা বিশ্বাস ও মূলনীতিতেও বিভিন্ন উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। মুজতাহিদ ইমামগণের শাখাগত মতবিরোধ এর অন্তর্ভুক্ত নয়। কারণ, এসব মতবিরোধের ফলে দীন ও মিল্লাত পৃথক হয়ে যায় না এবং এরূপ মতভেদকারীদেরকে ভিন্ন সম্প্রদায় বলে অভিহিত করা হয় না। এই ইজতিহাদী ও শাখাগত মতবিরোধকে সাম্প্রদায়িকতার রং দেয়া মুর্থতা, যা কোন মুজতাহিদের মতেই জায়েয নয়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ۗ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا اتَّوَاؤُ قُلُوبُهُمْ وَحِيلَةً থেকে উদ্ধৃত। এর অর্থ দেয়া ও খরচ করা। তাই দান-খয়রাত দ্বারা এর তফসীর করা হয়েছে। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ)

থেকে বর্ণিত আছে অর্থাৎ, যা আমল করার তা আমল করে। এতে দান-খয়রাত, নামায, রোযা ও সব সংকর্ম शामिल হয়ে যায়। প্রসিদ্ধ কেবরআত অনুযায়ী যদিও এখানে দান-খয়রাতেরই আলোচনা হবে, কিন্তু উদ্দেশ্য হবে সাধারণ সংকর্ম। যেমন এক হাদীসে হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন : আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে এই আয়াতের মর্ম জিজ্ঞেস করলাম যে, এই কাজ করে লোক ভীত-কম্পিত হবে? তারা কি মদ্যপান করে কিংবা চুরি করে? রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন : হে সিদ্দীক তনয়া, এরূপ নয়; বরং এরা তারা, যারা রোযা রাখে, নামায পড়ে এবং দান-খয়রাত করে। এতদসত্ত্বেও তারা শঙ্কিত থাকে যে, সম্ভবতঃ আমাদের এই কাজ আল্লাহর কাছে (আমাদের কোন ত্রুটির কারণে) কবুল হবে না। এ ধরনের লোকই সংকাজ দ্রুত সম্পাদন করে এবং তাতে অগ্রগামী থাকে। (আহমদ, তিরমিযী, ইবনে মাজা- মাযহারী) হযরত হাসান বসরী বলেন : আমি এমন লোক দেখেছি, যারা সংকাজ করে ততটুকুই ভীত হয়, যতটুকু তোমরা মন্দ কাজ করেও ভীত হও না।— (কুরতুবী)

أُولَٰئِكَ يَسْرِعُونَ فِي الْحَيَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ

দ্রুত সংকাজ করার অর্থ এই যে, সাধারণ লোক যেমন পার্থিব মুনাফার পেছনে দৌড়ে এবং অপরকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে, তারা ধর্মীয় উপকারের কাজে তেমনি সচেষ্ট হয়। এ কারণেই তারা ধর্মের কাজে অন্যদের চাইতে অগ্রগামী থাকে। عَمْرٍة এর অর্থ এমন গভীর পানি, যাতে মানুষ ডুবে যায় এবং যা প্রবেশকারীকে নিজের মধ্যে গোপন করে নেয়। এ কারণেই عَمْرٍة শব্দ আবরণ ও আবৃতকারী বস্তু অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এখানে তাদের মুশরেকসুলভ মুর্থতাকে عَمْرٍة বলা হয়েছে, যাতে তাদের অন্তর নিমজ্জিত ও আবৃত ছিল এবং কোনদিক থেকেই আলোর কিরণ পৌঁছাত না।

وَهُمْ أَعْمَالٌ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ ۗ অর্থাৎ, তাদের পথভ্রষ্টতার জন্যে তো এক শেরক ও কুফরের আবরণই যথেষ্ট ছিল, কিন্তু তারা এতেই ক্রান্ত ছিল না, অন্যান্য কুকর্মও অনবরত করে যেত।

مَثْرًا থেকে উদ্ধৃত। এর অর্থ ঐশ্বর্য ও

সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যশীল হওয়া। এখানে কওমকে আযাবে গ্রেফতার করার কথা আলোচনা করা হয়েছে। এতে ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সবাই অন্তর্ভুক্ত হবে। কিন্তু ঐশ্বর্যশালীদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে, তারাই দুনিয়ার বিপদাপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার কিছু না কিছু ব্যবস্থা করে নেয়। কিন্তু আল্লাহর আযাব যখন আসে, তখন সর্বপ্রথম তারাই অসহায় হয়ে পড়ে। এ আযাতে তাদেরকে যে আযাবে গ্রেফতার করার কথা বলা হয়েছে, হযরত ইবনে আব্বাস বলেন যে, এতে সে আযাব বোঝানো হয়েছে যা বদর যুদ্ধে মুসলমানদের তরবারি দ্বারা তাদের সরদারদের উপর পতিত হয়েছিল। কারও কারও মতে এই আযাব দুরীক্ষের আযাব বোঝানো হয়েছে, যা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বদদোয়ার কারণে মক্কাবাসীদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল। ফলে, তারা মৃত জন্তু, কুকুর এবং অস্থি পর্যন্ত খেতে বাধ্য হয়েছিল। রসূলে করীম (সাঃ) কাফেরদের জন্যে খুবই কম বদদোয়া করেছিলেন। কিন্তু এ স্থলে মুসলমানদের উপর তাদের নির্ধারিত সীমা ছাড়িয়ে গেলে তিনি বাধ্য হয়ে এরূপ দোয়া করেন-

اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها سنين كسنى يوسف

(বোখারী, মুসলিম, কুরতুবী)

مَسْكِينُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

অধিকাংশ তফসীরকারের মতে ۱৫

শব্দের সর্বনাম হরমের দিকে ফেরে, যা পূর্বে কোথাও উল্লেখ করা হয়নি। হরমের সাথে কোরাইশদের গভীর সম্পর্ক এবং একে নিয়ে তাদের গর্ব সুবিদিত ছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে শব্দটি উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। অর্থ এই যে, মক্কার কোরাইশদের আল্লাহর আযাতসমূহ শুনে মুখ ঘুরিয়ে সরে যাওয়া এবং না মানার কারণ হরমের সাথে সম্পর্ক ও তত্ত্বাবধানপ্রসূত অহংকার ও গর্ব ছিল। শব্দটি سمر থেকে উদ্ভূত। এর আসল অর্থ চাঁদনী রাত। চাঁদনী রাতে বসে গল্প-গুজব করা ছিল আরবদের অভ্যাস। তাই سمر শব্দটি গল্পগুজব করার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। سامر বলা হয় গল্প গুজবকারীকে। শব্দটি একবচন হলেও বহুবচনের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এখানে বহুবচনের অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। মুশরিকরা যে, আল্লাহর আযাতসমূহ অস্বীকার করত, তার এক কারণ ছিল হরমের সাথে সম্পর্ক, তত্ত্বাবধানজনিত অহংকার ও গর্ব, দ্বিতীয় কারণ বর্ণিত হয়েছে এই যে, তারা ভিত্তিহীন ও বানোয়াট গল্প-গুজবে মেতে থাকে, এটাই তাদের অভ্যাস। আল্লাহর আযাতসমূহের প্রতি তাদের কোন ঔৎসুক্য নেই।

مَسْكِينُونَ শব্দটি مَجْر থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ বাজে প্রলাপ ও

গালি-গালাজ। আল্লাহর আযাতসমূহ অস্বীকার করার এটা তৃতীয় কারণ। অর্থাৎ, তারা বাজে প্রলাপোক্তি ও গালিগালাজে অভ্যস্ত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) সম্পর্কে এমনি ধরনের ধৃষ্টতাপূর্ণ বাক্য তারা বলত।

এশার পর গল্প-গুজব করে সময় নষ্ট করা : রাত্রিকালে কিসসা-কাহিনী বলার প্রথা আরব-আজমে প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত রয়েছে। এতে অনেক ক্ষতিকর দিক ছিল এবং বৃথা সময় নষ্ট হত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এই প্রথা মিটানোর উদ্দেশ্যে এশার পূর্বে নিদ্রা যাওয়া এবং এশার পর অনর্থক কিসসা-কাহিনী বলা নিষিদ্ধ করে দেন। এর পেছনে

রহস্য ছিল এই যে, এশার নামাযের সাথে সাথে মানুষের সেদিনের কাজকর্ম শেষ হয়ে যায়। এই নামায সারাদিনের গোনাহসমূহের কাফফারাও হতে পারে। কাজেই এটাই তার দিনের সর্বশেষ কাজ হওয়া উত্তম। যদি এশার পর অনর্থক কিসসা-কাহিনীতে লিপ্ত হয়, তবে প্রথমতঃ এটা স্বয়ং অনর্থক ও অপছন্দনীয়; এছাড়া এই প্রসঙ্গে পরনিন্দা, মিথ্যা এবং আরও বহু রকমের গোনাহ সংঘটিত হয়। এর আরেকটি কুপরিণতি এই যে, বিলম্বে নিদ্রা গেলে প্রত্যুষে জাগ্রত হওয়া সম্ভবপর হয় না। এ কারণেই হযরত ওমর (রাঃ) এশার পর কাউকে গল্প-গুজবে মত্ত দেখলে শাসিয়ে দিতেন এবং কতককে শাস্তিও দিতেন। তিনি বলতেন : শীঘ্র নিদ্রা যাও; সম্ভবতঃ শেষরাতে তাহাজ্জুদ পড়ার তওফীক হয়ে যাবে।—(কুরতুবী)

أَقَامُوا الصَّلَاةَ থেকে أَرْمُواؤُنَّ بِرُءُوسِهِنَّ পর্যন্ত পাঁচটি এমন বিষয়

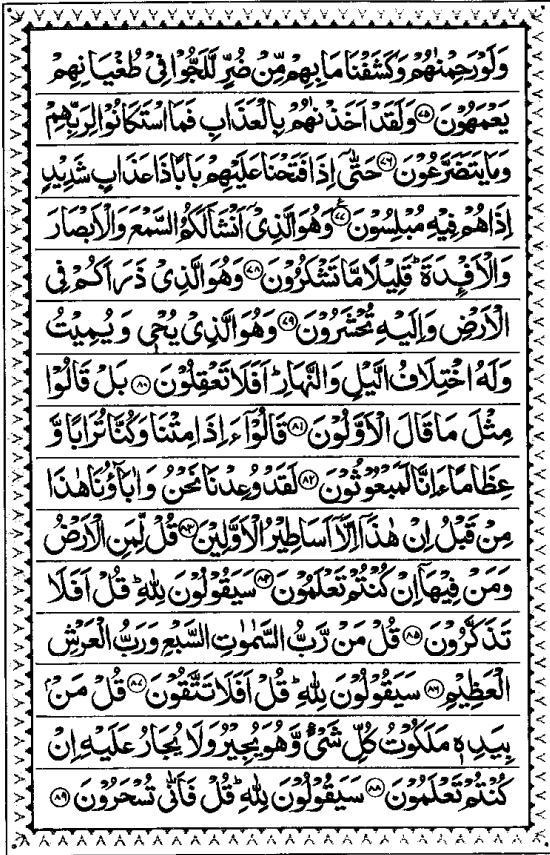
উল্লেখ করা হয়েছে, যা মুশরিকদের জন্যে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনে কোন না কোন স্তরে প্রতিবন্ধক হতে পারত। এগুলোর মধ্যে প্রত্যেকটি বিষয়ই যে অনুপস্থিত, তাও সাথে সাথে বর্ণনা করা হয়েছে। এর সারমর্ম এই যে, যেসব কারণ তাদের জন্যে ঈমানের পথে অন্তরায় হতে পারত, তার একটিও এখানে বর্তমান নেই। পক্ষান্তরে বিশ্বাস স্থাপনের জন্যে যেসব কারণ হতে পারে, সেগুলো সবই বর্তমান রয়েছে। এমতাবস্থায় তাদের অস্বীকার নির্ভেজাল শত্রুতা ও হঠকারিতা ছাড়া কিছুই নয়। পরবর্তী আযাতে একথা ব্যক্ত করা হয়েছে : بَلْ جَاءَهُمُ الْيَقِينُ

وَأَكْفَرُوا بِاللَّهِ وَالرُّسُولِ অর্থাৎ, রেসালত অস্বীকার করার কোন

যুক্তিসঙ্গত ও স্বভাবজাত কারণ তো বর্তমান নেই; এতদসত্ত্বেও তাদের অস্বীকারের কারণ এছাড়া কিছুই নয় যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) সত্য নিয়ে আগমন করেছেন, আর তারা সত্যকেই অপছন্দ করে— শুনতে চায় না। এর কারণ কুপ্রবৃত্তি ও কুবাসনার আধিক্য, রাজত্ব ও ক্ষমতার মোহ এবং মুর্থদের অনুসরণ। ঈমান ও নবুওয়ত স্বীকার করে নেয়ার পথে প্রতিবন্ধক হিসেবে যে পাঁচটি কারণ উল্লেখ করা হয়েছে, তন্মধ্যে এটিও একটি।

أَمْ لَوْ يَعْرِفُوا الْاَسْوَأَ অর্থাৎ, তাদের অস্বীকারের এক কারণ হতে

পারত এই যে, যে ব্যক্তি সত্যের দাওয়াত ও নবুওয়তের দাবী নিয়ে আগমন করেছেন, তিনি ভিন দেশের লোক। তাঁর বংশ, অভ্যাস, চালচলন ও চরিত্র সম্পর্কে তারা জ্ঞাত নয়। এমতাবস্থায় তারা বলতে পারত যে, আমরা এই নবীর জীবনালেখ্য সম্পর্কে অবগত নই; কাজেই তাঁকে নবী ও রসূল মেনে কিরাপে অনুসরণ করতে পারি? কিন্তু এখানে তো এরূপ অবস্থা নয়। বরং একথা সুস্পষ্ট ছিল যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) সম্ভ্রান্ততম কোরাইশ বংশে এই শহরেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং শৈশব থেকে শুরু করে তাঁর যৌবন ও পরবর্তী সমগ্র যমানে তাদের সামনেই অতিবাহিত হয়েছিল। তাঁর কোন কর্ম, কোন অভ্যাসই তাদের কাছে গোপন ছিল না। নবুওয়ত দাবী করার পূর্ব পর্যন্ত সমগ্র কাফের সম্প্রদায় তাঁকে 'সাদিক' ও 'আমীন'— সত্যবাদী ও বিশুদ্ধ বলে সম্বোধন করত। তাঁর চরিত্র ও কর্ম সম্পর্কে কেউ কোনদিন কোন সন্দেহই করেনি। কাজেই তাদের এ অজ্ঞহাতও অচল যে, তারা তাঁকে চেনে না।



(৭৫) যদি আমি তাদের প্রতি দয়া করি এবং তাদের কষ্ট দূর করে দেই, তবুও তারা তাদের অবাধ্যতা্য দিশেহারা হয়ে লেগে থাকবে। (৭৬) আমি তাদেরকে শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করেছিলাম, কিন্তু তারা তাদের পালনকর্তার সামনে নত হন না এবং কাকুতি-মিনতিও করল না। (৭৭) অবশেষে যখন আমি তাদের জন্যে কঠিন শাস্তির দ্বার খুলে দেব, তখন তাতে তাদের আশা ভঙ্গ হবে। (৭৮) তিনি তোমাদের কান, চোখ ও অন্তঃকরণ সৃষ্টি করেছেন; তোমরা খুবই অল্প কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে থাক। (৭৯) তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে ছড়িয়ে রেখেছেন এবং তারই দিকে তোমাদেরকে সমবেত করা হবে। (৮০) তিনিই প্রাণ দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান এবং দিবা-রাত্রির বিবর্তন তাঁরই কাছ, তবুও কি তোমরা বুঝবে না? (৮১) বরং তারা বলে যেমন তাদের পূর্ববর্তীরা বলত। (৮২) তারা বলে : যখন আমরা মরে যাব এবং মৃত্তিকা ও অস্থিতে পরিণত হব, তখনও কি আমরা পুনরুদ্ভূত হব? (৮৩) অতীতে আমাদেরকে এবং আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে এই ওয়াদাই দেয়া হয়েছে। এটা তো পূর্ববর্তীদের কম্প-কথা বৈ কিছুই নয়। (৮৪) বলুন পৃথিবী এবং পৃথিবীতে যারা আছে, তারা কার? যদি তোমরা জান, তবে বল। (৮৫) এখন তারা বলবে : সবই আল্লাহর। বলুন, তবুও কি তোমরা চিন্তা কর না? (৮৬) বলুন : সপ্তাকাশ ও মহা-আরশের মালিক কে? (৮৭) এখন তারা বলবে : আল্লাহ। বলুন, তবুও কি তোমরা ভয় করবে না? (৮৮) বলুন : তোমাদের জানা থাকলে বল, কার হাতে সব বস্তুর কর্তৃত্ব, যিনি রক্ষা করেন এবং যার কবল থেকে কেউ রক্ষা করতে পারে না? (৮৯) এখন তারা বলবে : আল্লাহর। বলুন : তাহলে কোথা থেকে তোমাদেরকে জাদু করা হচ্ছে?

وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ عَادَ فَإِسْكَانُوا إِلَيْهِمْ وَمَا يَتَّبِعُونَ

পূর্ববর্তী আয়াতে মুশরিকদের সম্পর্কে বলা হয়েছিল যে, তারা আযাবে পতিত হওয়ার সময় আল্লাহর কাছে অথবা রসূলের কাছে ফরিয়াদ করে। আমি যদি তাদের ফরিয়াদের কারণে দয়াপরবশ হয়ে আযাব সরিয়ে দেই, তবে মজ্জাগত অবাধ্যতার কারণে আযাব থেকে মুক্তি পাওয়ার পরক্ষণেই ওরা আবার নাফরমানীতে মশগুল হয়ে যাবে। এ আয়াতে তাদের এমনি ধরনের এক ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাদেরকে একবার এক আযাবে গ্রেফতার করা হয়। কিন্তু রসূলে করীম (সাঃ)-এর দোয়ার বরকতে আযাব থেকে মুক্তি পাওয়ার পরও তারা আল্লাহর কাছে নত হয়নি এবং কুফর ও শিরকেই আঁকড়ে থাকে।

মক্কাবাসীদের উপর দুর্ভিক্ষ এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দোয়ায় তা দূর হওয়া : পূর্বেই বলা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) মক্কাবাসীদের উপর দুর্ভিক্ষের আযাব সওয়ার হওয়ার দোয়া করেছিলেন। ফলে তারা ঘোরতর দুর্ভিক্ষে পতিত হয় এবং মৃত জন্তু, কুকুর ইত্যাদি ভক্ষণ করতে বাধ্য হয়। অবস্থা বেগতিক দেখে আবু সুফিয়ান রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে মদীনায় উপস্থিত হয় এবং বলে : আমি আপনাকে আত্মীয়তার কসম দিচ্ছি? আপনি কি একথা বলেননি যে, আপনি বিশ্বাসীদের জন্যে রহমতস্বরূপ প্রেরিত হয়েছেন? তিনি উত্তরে বললেন : নিঃসন্দেহে আমি একথা বলেছি এবং বাস্তবেও তাই। আবু সুফিয়ান বলল : আপনি স্বগোত্রের প্রধানদেরকে তো বদর যুদ্ধে তরবারী দ্বারা হত্যা করেছেন। এখন যারা জীবিত আছে, তাদেরকে ক্ষুধা দিয়ে হত্যা করছেন। আল্লাহর কাছে দোয়া করুন, যাতে এই আযাব আমাদের উপর থেকে সরে যায়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) দোয়া করলেন। ফলে, তৎক্ষণাৎ আযাব খতম হয়ে গেল। এর পরিপ্রেক্ষিতেই **وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ عَادَ** আয়াত নাযিল হয়।

এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, আযাবে পতিত হওয়া এবং অতঃপর তা থেকে মুক্তি পাওয়ার পরও তারা তাদের পালনকর্তার সামনে নত হয়নি। বাস্তব ঘটনা তাই ছিল। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দোয়ায় দুর্ভিক্ষ দূর হয়ে গেল, কিন্তু মক্কার মুশরিকরা তাদের শিরক ও কুফরে পূর্ববৎ অটল রইল।— (মাযহারী)

وَهُوَ يُجِيبُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা যাকে ইচ্ছা,

আযাব, মুসীবত ও দুঃখ-কষ্ট থেকে আশ্রয় দান করেন এবং কারও সাধ্য নেই যে, তার মোকাবেলায় কাউকে আশ্রয় দিয়ে তাঁর আযাব ও কষ্ট থেকে বাঁচিয়ে নেয়। দুনিয়ার দিক দিয়েও একথা সত্য যে, আল্লাহ তাআলা যার উপকার করতে চান, তাকে কেউ বাধা দিতে পারে না এবং যাকে কষ্ট ও আযাব দিতে চান, তা থেকেও কেউ তাকে বাঁচাতে পারে না। পরকালের দিক দিয়েও এই বিষয়বস্তু নির্ভুল যে, যাকে তিনি আযাব দেবেন, তাকে কেউ বাঁচাতে পারবে না এবং যাকে জ্ঞানাত ও সুখ দেবেন, তাকে কেউ ফেরাতে পারবে না।— (কুরতুবী)

بَلْ أَتَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿١٠٠﴾ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ
 وَلَدٍ شَيْئًا وَإِذَا قُلْتُمْ لِلرَّبِّ ادْعُوا كُلَّ مَا خَلَقَ
 وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١٠١﴾ عَلِيمٌ
 الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَلَّى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١٠٢﴾ قُلْ رَبِّ إِنَّمَا
 تُرِيدُنِي مِثْلَ مَا يُرِيدُونَ رَبِّي ﴿١٠٣﴾ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ
 الظَّالِمِينَ ﴿١٠٤﴾ وَإِنِّي عَلَىٰ أَنْ تُرِيدَ مَا تُنَادِي بِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿١٠٥﴾
 إِذْ قُمْنَا بِالنَّبِيِّ فِي أَحْسَنِ السَّنَةِ تَحَنَّنَ عَلَيْنَا مِمَّا كُنَّا نَعْمُونَ ﴿١٠٦﴾
 وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ ﴿١٠٧﴾ وَأَعُوذُ بِكَ
 رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ ﴿١٠٨﴾ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ
 ارْجِعُونِ ﴿١٠٩﴾ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ
 قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١١٠﴾ وَإِذْ أَنْفَعْنَا
 فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ﴿١١١﴾
 فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَلَحُّونَ ﴿١١٢﴾ وَمَنْ خَفَّتْ
 مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ
 خَالِدُونَ ﴿١١٣﴾ تَلْفَحُ وَهُمْ نَارُهَا وَهُمْ فِيهَا لَمَّخُونَ ﴿١١٤﴾

(১০) কিছুই নয়, আমি তাদের কাছে সত্য পৌঁছিয়েছি, আর তারা তো মিথ্যাবাদী। (১১) আল্লাহ কোন সন্তান গ্রহণ করেননি এবং তাঁর সাথে কোন মাবুদ নেই। থাকলে প্রত্যেক মাবুদ নিজ নিজ সৃষ্টি নিয়ে চলে যেত এবং একজন অন্যজনের উপর প্রবল হয়ে যেত। তারা যা বলে, তা থেকে আল্লাহ পবিত্র। (১২) তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানী। তারা শরীক করে, তিনি তা থেকে উর্ধ্বে। (১৩) বলুন : 'হে আমার পালনকর্তা! যে বিষয়ে তাদেরকে ওয়াদা দেয়া হয়েছে তা যদি আমাকে দেখান, (১৪) হে আমার পালনকর্তা! তবে আপনি আমাকে সোনাহাগার সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করবেন না। (১৫) আমি তাদেরকে যে বিষয়ের ওয়াদা দিয়েছি, তা আপনাকে দেখাতে অবশ্যই সক্ষম। (১৬) মন্দের জওয়াবে তাই বলুন, যা উত্তম। তারা যা বলে, আমি সে বিষয়ে সবিশেষ অবগত। (১৭) বলুন : 'হে আমার পালনকর্তা! আমি শয়তানের প্ররোচনা থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি, (১৮) এবং হে আমার পালনকর্তা! আমার নিকট তাদের উপস্থিতি থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি। (১৯) যখন তাদের কারণে কাছে মৃত্যু আসে, তখন সে বলে : 'হে আমার পালনকর্তা! আমাকে পুনরায় (দুনিয়াতে) প্রেরণ করুন, (১০০) যাতে আমি সংকর্মে করতে পারি, যা আমি করিনি। কখনই নয়, এ তো তার একটি কথার কথা মাত্র। তাদের সামনে পর্দা আছে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত। (১০১) অতঃপর যখন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে, সেদিন তাদের পারস্পরিক আত্মীয়তার বন্ধন থাকবে না এবং একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে না। (১০২) যাদের পাল্লা ভারী হবে, তারাই হবে সফলকাম, (১০৩) এবং যাদের পাল্লা হালকা হবে তারাই নিজেদের ক্ষতিসাধন করেছে, তারা দোষাখ্যেই চিরকাল বসবাস করবে। (১০৪) আগুন তাদের মুখমণ্ডল দগ্ন করবে এবং তারা তাতে বীভৎস আকার ধারণ করবে।

আনুষ্ঠানিক জ্ঞাতব্য বিষয়

قُلْ رَبِّ إِنَّمَا تُرِيدُنِي مِثْلَ مَا يُرِيدُونَ رَبِّي ﴿١٠٣﴾ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

এই দুই আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, কোরআনের অনেক আয়াতে মুশরিক ও কাফেরদের উপর আযাবের ভয় প্রদর্শন উল্লেখিত হয়েছে। কেয়ামতে এই আযাব হওয়া তো অকাট্য ও নিশ্চিতই, দুনিয়াতে হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। যদি এই আযাব দুনিয়াতে হয়, তবে রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর আমলের পরে হওয়ারও সম্ভাবনা আছে এবং তাঁর যমানায় তাঁর চোখের সামনে তাদের উপর কোন আযাব আসার সম্ভাবনাও আছে। দুনিয়াতে যখন কোন সম্প্রদায়ের উপর কোন আযাব আসে, তখন মাঝে মাঝে সেই আযাবের প্রতিক্রিয়া শুধু জ্বালামদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং সংলোকও এর কারণে পার্শ্বিক কষ্টে পতিত হয়। তবে পরকালে তারা কোন আযাব ভোগ করবে না, বরং এই পার্শ্বিক কষ্টের কারণে তারা সওয়াবও পাবে। কোরআন পাক বলে : وَاتَّقُوا يَوْمَئِذٍ إِذْ يُنْفِثُ السَّيْفُ الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّكُمْ : এখাৎ, এমন আযাবকে ভয় কর, যা এসে গেলে শুধু জ্বালামদের পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকবে না; বরং অন্যরাও এর কবলে পতিত হবে।

আলোচ্য আয়াতসমূহে রসূলুল্লাহ (সাঃ)—কে এই দোয়া শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, হে আল্লাহ, যদি তাদের উপর আপনার আযাব আমার সামনে এবং আমার চোখের উপরই আসে, তবে আমাকে এই জ্বালামদের সাথে রাখবেন না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) নিশাপ ছিলেন বিধায় আল্লাহর আযাব থেকে তাঁর নিরাপত্তা নিশ্চিত ছিল। তা সত্ত্বেও তাঁকে এই দোয়া শিক্ষা দেয়া হয়েছে, যাতে সওয়াব বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তিনি সর্ববিস্তার আল্লাহকে স্মরণ করেন এবং তাঁর কাছে ফরিয়াদ করতে থাকেন — (কুরতুবী)

وَإِنِّي عَلَىٰ أَنْ تُرِيدَ مَا تُنَادِي بِهِمْ لَقَدِيرٌ

অর্থাৎ, আমি আপনার সামনেই তাদের উপর আযাব দেখিয়ে দিতে পুরোপুরি সক্ষম। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন : আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এই উন্মত্তের উপর ব্যাপক আযাব না আসার ওয়াদা হয়ে গেছে। আল্লাহ বলেন : وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ ধ্বংস করব না। কিন্তু বিশেষ লোকদের উপর বিশেষ অবস্থায় দুনিয়াতেই আযাব আসা এর পরিপন্থী নয়। এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, আমি আপনাকেও তাদের আযাব দেখিয়ে দিতে সক্ষম। মক্কাবাসীদের উপর দুর্ভিক্ষ ও ক্ষুধার আযাব এবং বদর যুদ্ধে মুসলমানদের তরবারির আযাব রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর সামনেই তাদের উপর পতিত হয়েছিল।

إِذْ قُمْنَا بِالنَّبِيِّ فِي أَحْسَنِ السَّنَةِ

— অর্থাৎ, আপনি মন্দকে উত্তম দ্বারা, জ্বলুমকে ইনসাফ দ্বারা এবং নির্দয়তাকে দয়া দ্বারা প্রতিহত করুন। এটা রসূলুল্লাহ (সাঃ)—কে প্রদত্ত উত্তম চরিত্রের শিক্ষা, যা মুসলমানদের পারস্পরিক কাজ কারবারে সর্বদাই প্রচলিত আছে। জ্বলুম ও নির্যাতনের জওয়াবে কাফের ও মুশরিকদের ক্ষমা ও মার্জনাই করতে থাকা এবং তাদেরকে প্রত্যাঘাত না করার নির্দেশ পরবর্তীকালে জেহাদের আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। কিন্তু ঠিক জেহাদের অবস্থায় এই সচ্চরিত্রতার অনেক প্রতীক অবশিষ্ট রাখা হয়েছে, যেমন— কোন নারীকে হত্যা না করা, শিশু হত্যা না করা, ধর্মীয় পুরোহিত, যারা মুসলমানদের মোকাবেলায় যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি, তাদেরকে হত্যা না করা। কাউকে হত্যা করা হলে তার

নাক, কান ইত্যাদি ‘মুছলা’ না করা ইত্যাদি। তাই পরবর্তী আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)—কে শয়তান ও তার প্ররোচনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনার দোয়া শিক্ষা দেয়া হয়েছে, যাতে ঠিক যুদ্ধক্ষেত্রেও তাঁর পক্ষ থেকে শয়তানের প্ররোচনায় ন্যায় ও সুবিচার-বিরোধী কোন কাজ প্রকাশ না পায়। দোয়াটি এই :

وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ

হুম — শব্দের অর্থ প্রতারণা করা, চাপ দেয়া। পশ্চাদ্ধিক থেকে আওয়াজ দেয়ার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। শয়তানের প্ররোচনা ও চক্রান্ত থেকে আত্মরক্ষার জন্যে এটা একটা সুদূরপ্রসারী অর্থবহ দোয়া। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মুসলমানদেরকে এই দোয়া পড়ার আদেশ করেছেন, যাতে ক্রোধ ও গোসসার অবস্থায় মানুষ যখন বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হয়ে পড়ে, তখন শয়তানের প্ররোচনা থেকে এই দোয়ার বরকতে নিরাপদ থাকতে পারে। এ ছাড়া শয়তান ও জিনদের অন্যান্য প্রভাব ও আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্যেও এ দোয়াটি পরীক্ষিত। হযরত খালেদ (রাঃ)—এর রাত্রিকালে নিদ্রা আসত না। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)—তাকে নিম্ন বর্ণিত দোয়াটি পাঠ করে শোয়ার আদেশ দিলেন। তিনি পড়া শুরু করলে অনিদ্রার কবল থেকে মুক্তি পান। দোয়াটি এই :

اعوذ بكلمات الله التامة من غضب الله وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشيطان وان يحضرون .

أَنْ يَحْضُرُونِ —সহীহ মুসলিমে হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন : শয়তান সব কাজে সর্বাবস্থায় তোমাদের কাছে আসে এবং সব কাজে অন্তরকে পাপকর্মে প্ররোচিত করতে থাকে।—(কুরতুবী)

এই প্ররোচনা থেকেই আশ্রয় প্রার্থনার জন্যে দোয়াটি শেখানো হয়েছে।

رَبِّ الرَّجِيمِ —অর্থাৎ, মৃত্যুর সময় যখন কাফের ব্যক্তি পরকালের আযাব অবলোকন করতে থাকে, তখন এরূপ বাসনা প্রকাশ করে, আফসোস, আমি যদি পুনরায় দুনিয়াতে ফিরে যেতাম এবং সংকর্ষ করে এই আযাব থেকে রেহাই পেতাম।

ইবনে জরীর ইবনে জুরায়জের রেওয়াজে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন : মৃত্যুর সময় মুমিন ব্যক্তি রহমতের ফেরেশতা ও রহমতের আয়োজন সামনে দেখতে পায়। ফেরেশতা তাকে জিজ্ঞেস করে ; তুমি কি পুনরায় দুনিয়াতে ফিরে যেতে চাও? সে বলে, আমি দুঃখ-কষ্টের জগতে ফিরে গিয়ে কি করব? আমাকে এখন আল্লাহর কাছে নিয়ে যাও। কাফেরকে একথা জিজ্ঞেস করা হলে সে বলে, অর্থাৎ, আমাকে দুনিয়াতে ফিরিয়ে নিয়ে যাও।

رَبِّ الرَّجِيمِ

كَلَامَ رَبِّهَا كَلِمَةً هِيَ قَائِلُهَا وَمِنْ دَرَاهِمِهِمْ رَزَقٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ

بُرُزٌ —এর শাব্দিক অর্থ অন্তরায় ও পৃথককারী বস্তু। দুই অবস্থা অথবা দুই বস্তুর মাঝখানে যে বস্তু আড়াল হয় তাকে বরযখ বলা হয়। এ কারণেই মৃত্যুর পর কেয়ামত ও হাশর পর্যন্ত কালকে বরযখ বলা হয়। কারণ, এটা ইহলৌকিক জীবন ও পারলৌকিক জীবনের মাঝখানে সীমা প্রাচীর।

আয়াতের অর্থ এই যে, মরণোন্মুখ ব্যক্তির ফেরেশতাদেরকে পুনরায় দুনিয়ায় পাঠানোর কথা বলা শুধু একটি কথা মাত্র, যা সে বলতে বাধ্য। কেননা, এখন আযাব সামনে এসে গেছে। কিন্তু এখন এই কথার কোন ফায়দা নেই। কারণ, সে বরযখে পৌঁছে গেছে। বরযখ থেকে কেউ দুনিয়াতে ফিরে আসে না এবং কেয়ামত ও হাশর-নশরের পূর্বে পুনর্জীবনও পায় না, এটাই আইন।

وَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ

—কেয়ামতের দিন দু'বার শিগায় ফুৎকার দেয়া হবে। প্রথম ফুৎকারের ফলে যমীন-আসমান ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সব ধ্বংস হয়ে যাবে এবং দ্বিতীয় ফুৎকারের ফলে পুনরায় সব মৃত জীবিত হয়ে উঠিত হবে। কোরআন পাকের ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ فِي مَعَاظِرُكَ يُنظَرُونَ

আলোচ্য আয়াতে শিগায় প্রথম ফুৎকার বোঝানো হয়েছে, না দ্বিতীয় ফুৎকার— এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। ইবনে জুবায়রের রেওয়াজে হযরত ইবনে-আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে যে, এই আয়াতে প্রথম ফুৎকার বোঝানো হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ বলেন এবং আতার রেওয়াজে ইবনে আব্বাস থেকেও বর্ণিত আছে যে, দ্বিতীয় ফুৎকার বোঝানো হয়েছে। তফসীরে-মাহহারীতে একেই সঠিক বলা হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদের ভাষ্য এই যে, কেয়ামতের দিন প্রত্যেক পুরুষ ও নারীকে হাশরের ময়দানে আনা হবে এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমগ্র মানবমন্ডলীর জমজমাট সমাবেশের সামনে খাড়া করা হবে। অতঃপর আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে একজন ঘোষক ঘোষণা করবে, সে অমুকের পুত্র অমুক। যদি কারও কোন প্রাপ্য তার যিম্মায় থাকে, তবে সে সামনে এসে তা আদায় করুক। তখন এমনি সংকটময় সময় হবে যে, পুত্র আনন্দিত হবে পিতার যিম্মায় নিজের কোন প্রাপ্য আছে দেখলে এবং পিতা আনন্দিত হবে পুত্রের যিম্মায় নিজের কোন প্রাপ্য দেখলে। এমনিভাবে স্বামী-স্ত্রী ও ভাই-বোনের মধ্যে কারও যিম্মায় কারও প্রাপ্য থাকলে সেও তা আদায় করতে উদ্যত ও সচেষ্ট হবে। এই সংকটময় সময় সম্পর্কেই আলোচ্য আয়াতে فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ —বলা হয়েছে। অর্থাৎ, তখন পারস্পরিক আত্মীয়তার বন্ধন কোন উপকারে আসবে না। কেউ কারও প্রতি রহম করবে না।

প্রত্যেকেই নিজের চিন্তায় বিভোর থাকবে। নিম্নোক্ত আয়াতের বিষয়বস্তু তাই

يَوْمَ يُنْفَخُ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُثْرِهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَيْنِيهِ

অর্থাৎ, সেদিনে প্রত্যেক মানুষ তার ভাই, পিতা-মাতা, স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির কাছ থেকে দূরে পলায়ন করবে।

হাশরে মুমিন ও কাফেরের অবস্থার পার্থক্য : কিন্তু এ আয়াতে কাফেরদের অবস্থান বর্ণনা করা হয়েছে—মুমিনগণের নয়। কারণ, উপরে কাফেরদের প্রসঙ্গই আলোচিত হয়েছে। মুমিনদের অবস্থা সম্পর্কে ঋণ্য কোরআন বলে যে, أَلْعَمَلُ بِهِمْ دُرِّيَّةٌ هُمْ —অর্থাৎ, সংকর্মপরায়ণ মুমিনদের সন্তান-সন্ততিকোও আল্লাহ্ তাআলা (ঈমানদার হওয়ার শর্তে) তাদের পিতাদের সাথে সংযুক্ত করে দেবেন। হাদীসে আছে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন : কেয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে যখন সবাই পিপসার্ত হবে, তখন যেসব মুসলমান সন্তান অপ্রাপ্ত বয়সে মৃত্যু মুখে পতিত হয়েছিল, তারা জান্নাতের পানি নিয়ে বের হবে। মানুষ তাদের কাছে পানি চাইবে।

المؤمنون

৩৫০

قَدْ اَفْلَحَ

اَلَمْ تَكُنْ اِلٰتِي سُّئِلَ عَلَيْكُمْ فَلْتَمُّوْهَا تَكْذِبُوْنَ ۝۱۰۫ وَاَلُوْا
 رَبِّيْنَ اَعْلَيْتُمْ عَلَيْنَا سَمْعُوْنَا وَكُنَّا قَوْمًا صٰلِحِيْنَ ۝۱۱۫ رَبَّنَا
 اَخْرِجْنَا مِنْهَا وَاِنْ عُدْنَا وَاَنْتَا ظٰلِمُوْنَ ۝۱۲۫ وَاَلِ اٰخِسُوْا فِيْهَا
 وَلَا تَكْفُرُوْنَ ۝۱۳۫ اِنَّهٗ كَانَ فَرِيْقًا مِّنْ عِبَادِيْ يَقُوْلُوْنَ
 رَبَّنَا اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَاَرْحَمْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّحِيْمِيْنَ ۝۱۴۫
 فَاتَّخَذُوْهُمُ سَخِرًا حَتّٰى اَسْوَوْا لِيْكَرِيْ وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ
 تَصٰكِرُوْنَ ۝۱۵۫ اِنِّيْ حَزِيْنٌ لِّيَوْمِ بٰعَدِيْ وَاَلَّهُمْ هُمُ
 الْفٰكِرُوْنَ ۝۱۶۫ قُلْ كَمْ لِيْ سَعْمٌ فِى الْاَرْضِ عَدَدِ سِنِيْنَ ۝۱۷۫
 قَالُوْا اَلَيْسَ اَيُّوْمًا وَّبَعْضُ يَوْمٍ قَسِيْلٌ اَلْعٰدِيْنَ ۝۱۸۫
 قُلْ اِنْ لِّيْ سَعْمٌ اِلَّا قَلِيْلٌ لَّا اُوْاكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝۱۹۫
 اَفَحَسِبْتُمْ اَنْتُمْ اَخْلَقْتُمْكُمْ عَسِيْرًا وَاَكْمَرْنَا الْبِيْنَاءَ لَّا تَرْجِعُوْنَ ۝۲۰۫
 فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۝۲۱۫ اَلَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ
 الْكَرِيْمِ ۝۲۲۫ وَمَنْ يَّدْعُ مَعَ اللّٰهِ الْهٰٓءَا الْخَرٰٓءَ لَا يَرْهٰنَ
 لَهٗ بِهٖ ۝۲۳۫ اِنَّمَا حِسَابُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ اِنَّهٗ لَا يُقِيْمُ الْاٰلِغُرُوْنَ ۝۲۴۫
 وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَاَرْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّحِيْمِيْنَ ۝۲۵۫

(১০৫) তোমাদের সামনে কি আমার আয়াতসমূহ পাঠিত হত না? তোমরা তো সেগুলোকে মিথ্যা বলতে। (১০৬) তারা বলবে : হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা দুর্ভাগ্যের হাতে পরাভূত ছিলাম এবং আমরা ছিলাম বিদ্রোহী জাতি। (১০৭) হে আমাদের পালনকর্তা! এ থেকে আমাদেরকে উদ্ধার কর; আমরা যদি পুনরায় তা করি, তবে আমরা গোনাহগার হব। (১০৮) আল্লাহ বলবেন : তোমরা শিক্ত অবস্থায় এখানেই পড়ে থাক এবং আমার সাথে কোন কথা বলো না। (১০৯) আমার বন্দীদের একদলে বলতে হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। অতএব তুমি আমাদেরকে ক্ষমা কর ও আমাদের প্রতি রহম কর। তুমি তো দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু। (১১০) অতঃপর তোমরা তাদেরকে ঠাট্টার পাত্ররূপে গ্রহণ করতে। এমনকি, তা তোমাদেরকে আমার স্মরণ ভুলিয়ে দিয়েছিল এবং তোমরা তাদেরকে দেখে পরিহাস করতে। (১১১) আজ আমি তাদেরকে তাদের সবরের কারণে এমন প্রতিদান দিয়েছি যে, তারা ই সফলকাম। (১১২) আল্লাহ বলবেন : তোমরা পৃথিবীতে কতদিন অবস্থান করলে বছরের গণনায়? (১১৩) তারা বলবে, আমরা একদিন অথবা দিনের কিছু অংশ অবস্থান করেছি। অতএব আপনি গণনাকারীদেরকে জিজ্ঞেস করুন। (১১৪) আল্লাহ বলবেন : তোমরা তাতে অস্পন্দিতই অবস্থান করেছ, যদি তোমরা জানতে? (১১৫) তোমরা কি খারণা কর যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার কাছে ফিরে আসবে না? (১১৬) অতএব শীর্ষ মহিমায় আল্লাহ, তিনি সত্যিকার মালিক, তিনি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। তিনি সম্মানিত আরশের মালিক। (১১৭) যে কেউ আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্যকে ডাকে, তার কাছে যার সন্দ নেই, তার হিসাব তার পালনকর্তার কাছে আছে। নিশ্চয় কাফেররা সফলকাম হবে না। (১১৮) বলুন : হে আমার পালনকর্তা, ক্ষমা করুন ও রহম করুন। রহমকারীদের মধ্যে আপনি শ্রেষ্ঠ রহমকারী।

তারা বলবে, আমরা আমাদের পিতা-মাতাকে তালাশ করছি। এ পানি তাদের জন্যেই।—(মায়হারী)

এমনিভাবে হযরত ইবনে ওমরের রেওয়াজেতে ইবনে আসাকির বর্ণিত এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : কেয়ামতের দিন বংশগত অথবা বৈবাহিক সম্পর্কজনিত আত্মীয়তা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে (কেউ কারও উপকার করতে পারবে না) —আমার বংশ ও আমার বৈবাহিক সম্পর্কজনিত আত্মীয়তা ব্যতীত। আলেমগণ বলেন : নবী করীম (সাঃ)—এর বংশের মধ্যে সমগ্র মুসলমান উম্মতও অন্তর্ভুক্ত থাকবে। কারণ, তিনি উম্মতের পিতা এবং তাঁর পুণ্যময়ী বিবিগণ উম্মতের মাতা। মোটকথা, আত্মীয়তা ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক কাজে আসবে না, কিন্তু এটা কাফেরদের অবস্থা। মুমিনগণ একে অপরের সুপারিশ ও সাহায্য করবে এবং তাদের সম্পর্ক উপকারী হবে।

وَالْيَتٰسٰرُوْنَ — অর্থাৎ, পরস্পর কেউ কারও সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ

করবে না। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে وَقُلْ يٰٓعٰلَمِيْنَ

وَالْيَتٰسٰرُوْنَ অর্থাৎ, হাশরের ময়দানে একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে।

এই আয়াত সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন : হাশরে বিভিন্ন অবস্থানস্থল হবে এবং প্রত্যেক অবস্থানস্থলের অবস্থা বিভিন্নরূপ হবে। এমনও সময় আসবে, যখন কেউ কাউকে জিজ্ঞেস করবে না। এরপর কোন অবস্থানস্থলে ভয়ভীতি ও আতঙ্ক হ্রাস পেলে একে অপরের অবস্থা জিজ্ঞেস করবে।—(মায়হারী)

فَمَنْ ثَمَّرْتُمْ مَوٰزِيْنُهٗ قَالُوْا لَيْكُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوٰزِيْنُهٗ

قَالُوْا لِكُلِّ اَلَّذِيْنَ خَسِرُوْا اَنْفُسَهُمْ فِىْ جَهَنَّمَ خٰلِدُوْنَ

অর্থাৎ, যে ব্যক্তির নেকীর পাল্লা ভারী হবে, সে-ই হবে সফলকাম। পক্ষান্তরে যার নেকীর পাল্লা হাল্কা হবে, সে দুনিয়াতে নিজেই নিজের ক্ষতি করেছে। এখন সে চিরকালের জন্যে জাহান্নামে থাকবে। এ আয়াতে শুধু কামেল মুমিন ও কাফেরদের ব্যাপারেই তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে, এখানে তাদেরই আমল ও পরিণতি উল্লেখ করা হয়েছে। কামেল মুমিনদের পাল্লা ভারী হবে এবং সফলকাম হবে। কাফেরদের পাল্লা হাল্কা হবে। ফলে, তাদেরকে চিরকালের জন্যে জাহান্নামে থাকতে হবে।

وَمَنْ فُجِّرَهَا كٰلِحُوْنَ — অর্থাৎ, অধিধানে এমন ব্যক্তিকে বলা হয়, যার

ওষ্ঠদুয় মুখের দাঁতকে আবৃত করে না। এক ওষ্ঠ উপরে উখিত এবং অপর ওষ্ঠ নীচে বুলে থাকে, ফলে দাঁত বের হয়ে থাকে। এটা খুব বীভৎস আকার হবে। জাহান্নামে জাহান্নামী ব্যক্তির ওষ্ঠদুয়ও তদ্রূপ হবে এবং দাঁত খোলা ও বেরিয়ে থাকবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَالْمُكَلِّمُوْنَ — হযরত হাসান বসরী বলেন : এটা হবে জাহান্নামীদের

সর্বশেষ কথা। এরপরই কথা না বলার আদেশ হয়ে যাবে। ফলে, তারা কারও সাথে বাক্যালাপ করতে পারবে না ; জন্তুদের ন্যায় একজন অপরজনের দিকে তাকিয়ে খেউ খেউ করবে। বায়হাকী মুহাম্মদ ইবনে কা'ব থেকে বর্ণনা করেন : কোরআনে জাহান্নামীদের পাঁচটি আবেদন উদ্ধৃত করা হয়েছে। তন্মধ্যে চারটির জওয়াব দেয়া হয়েছে এবং পঞ্চমটির জওয়াবে وَالْمُكَلِّمُوْنَ বলা হয়েছে। এটাই হবে তাদের শেষ কথা। এরপর